ঋষি
অরবিন্দ

শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।
(কলিকাতা গেজেট—৬ই জুন, ১৯৪২)
আসাম টেক্‌স্‌টবুক কমিটি কর্তৃক Supplementary Reader-রূপে অনুমোদিত।
(শিলং গেজেট—২৩.৮।৫৫)
নূতন সংস্করণ—১৯৬৭
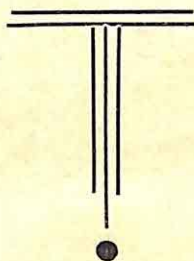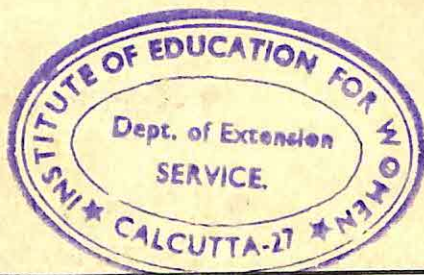
ঋষি অরবিন্দ

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN
Dept. of Extension
SERVICE.
CALCUTTA-27

দেব সাহিত্য কুটীর

উপহার

বাণী

"ধর্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। যাঁহারা জাতীয়তার মহান্ আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়, শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী, বিশ্ব-মঙ্গলকারিণী ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন ; ধর্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান ! আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বলে যেন কার্য না কর, সকলে মিলিয়া এক প্রতিজ্ঞা, এক পন্থা, এক উপায় নির্ধারণ করিয়া যাহা ধর্মসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী, তাহাই করিতে শিখ।"

—শ্রীঅরবিন্দ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের
স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে
শ্রীমার বাণী—

"ওগো ভারত আত্মা, ভারত মাতা, তোমাকে আজ আমরা প্রণাম করি। অন্ধকারময় ঘোর দুর্দিনেও তোমার সন্তানদের কখনো তুমি পরিত্যাগ করো নি। এমন কি যখন তারা তোমার দিকে চায় নি, তোমার কথায় কর্ণপাত করে নি, যখন তোমাকে ছেড়ে তারা অন্যের দাসত্ব করেছিল, তখনও তুমি তাদের রক্ষা করে এসেছ। এখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, দাসত্বমুক্তির এই শুভ প্রভাতে তাই তোমার মুখে এক দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠেছে। এই মহা সন্ধিক্ষণে তোমাকে আমরা প্রণাম জানাই। এবার তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, যেন আমরা সকল সময়েই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের পথ গ্রহণ করতে পারি, জগতের সকল লোকের সামনে যেন আমরা তোমার প্রকৃত স্বরূপটি উদঘাটিত করে দেখাতে পারি, জগতের সকল জাতের বন্ধু ও সহায় হয়ে যেন আমরা আত্মার অগ্রগতির পথে সকলেরই পথপ্রদর্শক হতে পারি।"

—শ্রীমা

জীবন-পঞ্জী

১৮৭২—১৫ই আগস্ট তারিখে কলিকাতায় জন্ম।

১৮৭৯—মাতাপিতার সহিত বিলাত যাত্রা।

১৮৯০—আই-সি-এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার।

১৮৯৩—বারোদায় গমন ও রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কার্য গ্রহণ।

১৮৯৮—দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নিকট বাংলাভাষা শিক্ষারম্ভ।

১৯০০—কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান।

১৯০৫—কংগ্রেসের কাশী অধিবেশনে উপস্থিতি।

১৯০৬—বরোদা হইতে বাংলায় আগমন। কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে যোগদান। কংগ্রেসে প্রবেশ।

১৯০৭—২৭শে জুন বন্দে মাতরমের সম্পাদক হিসাবে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া হাজতবাস। ২২শে আগস্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ। কংগ্রেসের মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনে ও বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান।

১৯০৮—২রা মে বোমার মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার। ৫ই মে হইতে এক বৎসর কারাবাস।

১৯০৯—৫ই মে নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ।

১৯১০—মার্চ মাসে বাংলা ১৩১৬ সালে কলিকাতা হইতে চন্দননগর যাত্রা। ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ।

১৯১৯—শ্রীঅরবিন্দের পত্নী মৃণালিনী দেবীর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর বাটীতে পরলোকগমন।

১৯১৪—১৫ই আগস্ট 'আর্য' নামক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ।

১৯২০—আশ্রমে শ্রীমার স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ।

১৯২৩—গয়া-কংগ্রেসের পর চিত্তরঞ্জনের পণ্ডিচেরী আশ্রমে গমন।

১৯২৮—২৯শে মে রবীন্দ্রনাথের পণ্ডীচেরীতে গমন ও অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ।

১৯৫০—৫ই নভেম্বর দেহত্যাগ।

ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনের নেতারূপে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাগারের মধ্যেই মৃত্যুর আসনে বসে শ্রীঅরবিন্দ তপস্যা করেন এবং সেই কারাগারের ভেতরেই তাঁর ইষ্টদেবতা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে তাঁকে দিব্য বর দান করেন! কারামুক্তির পর তিনি নতুনতর তপস্যার মধ্যে ডুবে গেলেন। এই মানুষের মধ্যেই আছে সেই দিব্য শক্তি, যার সাহায্যে মানুষ একদিন এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এই মানবী দেহেই দিব্যজীবন লাভ করতে পারবে। সামান্য অ্যামিবা থেকে ক্রমবিকাশের স্তরে এই মনোময় মানুষ তৈরী হয়েছে। ক্রমবিকাশের ধারায় সব চেয়ে বড় জিনিস হলো মানুষ আর তার মন। এইটেই কিন্তু ক্রমবিকাশের শেষতম অধ্যায় নয়। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, মানুষ এর পরেও নতুন উন্নততর স্তরে এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেই উন্নততর স্তরে পৌঁছতে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় লাগবে কিন্তু মানুষ নিজের চেষ্টায় সেই উন্নততর অবস্থাকে আগিয়ে আনতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে সাধনা করে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই উন্নততর স্তরে পৌঁছনো সম্ভব এবং বিশ্বের কাছে যে পরমবাণী তিনি তুলে ধরেছেন তা হলো, একদিন প্রত্যেক মানুষই সেই উন্নততর দিব্যজীবনের অধিকারী হবে, এমন কি মৃত্যু তখন হবে মানুষের ইচ্ছাধীন। আজ সমস্ত সভ্য জগৎ তাই পরম বিস্ময়ে এই ভারত-ঋষির তপস্যা লব্ধ বাণীকে বুঝতে চেষ্টা করছে।

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের 'The Vedantin's Prayer' অর্থাৎ বৈদান্তিকের প্রার্থনা কবিতার অনুবাদ—

আত্মা মহীয়ান,
হৃদয়ের নীরবতার মাঝে যার স্তব্ধ ধ্যানভূমি,
জ্যোতিঃ অনির্বান,
আছ শুধু তুমি !
হায়, তবে অন্ধকার কেন ছায় আমার নয়নে,
মেঘ ওঠে ধূমি'
আলোর গগনে ?
এ রোল বিষম
স্তব্ধ কর—চাহি তব চিরন্তন স্বর শুনিবারে।
পিপাসার্ত সম।
এ দীপ্ত মায়ায়
দূর কর—অনন্তের তটপ্রান্ত ভারাক্রান্ত করে
যাহা নিজ ভারে।

শ্রীঅরবিন্দ

আকাশে নতুন নক্ষত্র

ইংরেজী ১৮৭২ সাল।

পৃথিবীর এক যুগসন্ধিক্ষণ।

ঐ বছরেই ফরাসী-জার্মান যুদ্ধের পর ইওরোপে শুরু হয় এক নতুন যুগ।

ইতালীর জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক জোসেফ ম্যাটসিনীর তিরোধান ঘটে ঐ বছরেই।

ম্যাটসিনী ইতালীর রাজনীতিকে এক নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। জাতির ভেতর এনেছিলেন এক নতুন প্রাণের স্পন্দন। তাই তাঁর মৃত্যুকে মহাকাশের নক্ষত্র পতনের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছিল সেদিন।

সেই স্মরণীয় ১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের আকাশে উদয় হল এক নতুন নক্ষত্রের।

সে নক্ষত্র অরবিন্দ—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

পৃথিবীর আকাশে বাতাসে তখন এক নতুন সুরের প্রতিধ্বনি—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মানুষের অন্তর আকুল—উন্মুখ।

কলকাতার এক পল্লীতে সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করলেন ভাবী যুগের স্বাধীনতার পূজারী অরবিন্দ।

অরবিন্দের পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। উত্তরকালে তিনি ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ নামেই বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

তাঁদের আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গের কোন্নগরে। কোন্নগরের মিত্র ও ঘোষ বংশের আভিজাত্যের খ্যাতি বহুকালের। সেই বিখ্যাত ঘোষ বংশেরই ছেলে অরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন।

বিচিত্র জীবন এই কৃষ্ণধনের।

অচলায়তনে আবদ্ধ ছিল তখন ভারতের হিন্দুসমাজ। মরা কাটলে ধর্ম নষ্ট হবে, সেই ভয়ে হিন্দু যুবকরা এনাটমি ও সার্জারি শিখতে ইতস্ততঃ করে—কালাপানি পার হয়ে বিলেতে গেলে তখন হিন্দুদের জাত যায়।

সেই সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কৃষ্ণধন বিলেত গেলেন এবং কিছুকাল পরে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ডি. উপাধি নিয়ে ফিরে এলেন দেশে।

কৃষ্ণধন ভেবেছিলেন সমাজের বিধি-নিষেধ আর শাসন-অনুশাসনের বেড়াজালকে তিনি ডিঙিয়ে যাবেন। অন্ধ-সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ তাঁর দিকে হয়তো ফিরেও তাকাবে না!

কিন্তু তা হল না। কৃষ্ণধন বিলেত থেকে ফিরতেই সমাজপতিরা নাক সিটকাতে লাগলেন। বললেন—কালাপানি পার হয়ে কৃষ্ণধন ম্লেচ্ছদেশে গিয়েছিল—তার জাত গিয়েছে—সেজন্য তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

কথা শুনে চমকে উঠলেন কৃষ্ণধন—একি অদ্ভুত কথা! সমুদ্র পার হলেই জাত যায়!

এ ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি মানবো না। আমি করবো না প্রায়শ্চিত্ত।

সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন কৃষ্ণধন।

সমাজপতিরা ভয়ানক খেপে গেলেন। জোট পাকালেন সমস্ত গ্রামবাসীদের নিয়ে।

এমন অধর্মী এমন কুলাঙ্গারকে 'একঘরে' করতে হবে, গ্রামছাড়া করতে হবে তাকে।

গ্রামের লোকেরা সমাজপতিদের কথাতেই সায় দিল। সায়

না দিয়েও কোন উপায় ছিল না। কারণ সমাজপতিদের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। তাঁরাই ছিলেন সমাজের হর্তাকর্তা-বিধাতা।

কৃষ্ণধন বুঝলেন—এ অবস্থায় গ্রামে থাকা আর চলবে না। থাকলেও অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হবে।

তাই গ্রাম ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন কৃষ্ণধন। এক ব্রাহ্মণের কাছে নামমাত্র মূল্যে নিজের বাড়ি-ঘর বিক্রি করলেন। তারপর জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়।

অতি বিচিত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন ডাঃ ঘোষ। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সিভিল সার্জন। তাঁর আচার-ব্যবহার ছিল খাঁটী সাহেবী ধরনের। তাহলেও তিনি সে যুগের অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীদের মত স্বজাতি ও স্বদেশকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন না। স্বদেশবাসীর প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ব-বোধ। দরিদ্রের দুঃখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হত। কেউ বিপদে পড়ে সাহায্য চাইলে তিনি প্রাণপণে তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন।

অরবিন্দ পিতার নিকটই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন এই সদ্‌গুণ—দরিদ্রের প্রতি দয়া, বিনয়, সৌজন্য ও হৃদয়ের মাধুর্য।

জননী স্বর্ণলতাও পুত্র অরবিন্দের চরিত্র-গঠনে অনেকাংশে সাহায্য করেছিলেন। স্বর্ণলতা দেবীর পিতা রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সে-যুগের একজন নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি। তাঁর দেবতুল্য চরিত্র প্রভাবে তখনকার দিনে বঙ্গীয় সমাজ এক অভিনব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অরবিন্দ তাঁর জননীর নিকট মাতামহের সেই গুণগুলি লাভ করেছিলেন। রাজনারায়ণের প্রতিভা, মহত্ত্ব ও ঋষি-দৃষ্টি অরবিন্দের জীবনে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল।

শিক্ষা জীবন

কৃষ্ণধনের চার ছেলে। বিনয়ভূষণ সবচেয়ে বড়, দ্বিতীয় মনোমোহন, তৃতীয় অরবিন্দ ও চতুর্থ বারীন্দ্রকুমার। একটিমাত্র মেয়ে —সরোজিনী ঘোষ।

কৃষ্ণধন নিজে ছিলেন বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর ভাবনা-চিন্তা ধরন-ধারণ সবই আলাদা। তিনি মনে করতেন প্রকৃত শিক্ষা ইংরেজদের স্কুল ছাড়া হয় না। ভাল আদবকায়দা শিখতে হলে ইংরেজ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশা দরকার। তাই নিজের ছেলে-মেয়েদের তিনি ইওরোপীয় বিদ্যালয়ে ভরতি করে দিলেন।

পাঁচ বছরের বালক অরবিন্দ তাঁর দাদা বিনয়ভূষণ ও মনোমোহনের সঙ্গে দার্জিলিং-এর লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ইওরোপীয় বালকদের সঙ্গে পড়াশোনা করতে লাগলেন।

ইওরোপীয় বালকদের কাছে ভারতীয় বালকরা ছিল তখন অবজ্ঞার ও করুণার পাত্র। কিন্তু সেদিনের অরবিন্দকে দেখে তাদের মন থেকে সেই ভাব দূর হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর স্মৃতিশক্তি, প্রতিভা ও স্বভাবের মাধুর্য মুগ্ধ করেছিল ইওরোপীয় ছাত্র এবং অধ্যাপকদের। সম্পূর্ণ বিজাতীয় আবেষ্টনীর মধ্যে অরবিন্দের শিক্ষার প্রথম সূচনা সত্যি সফল হয়েছিল। সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি দু'বছর।

ডাঃ কৃষ্ণধন ছিলেন সাহেবী শিক্ষার ভক্ত। তাঁর সাহেবীয়ানার ঝোঁক এত বেশী ছিল যে তিনি নিজের দেশে ছেলেদের ইওরোপীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না। স্থির করলেন ছেলেদের বিলেতে রেখে পড়াবেন।

অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখনই তিনি সপরিবারে বিলেত যাত্রা করলেন।

বিলেতে জাহাজ পৌঁছবার আগেই সমুদ্রবক্ষে জাহাজের মধ্যে জন্ম হল ছোট ছেলে বারীন্দ্রকুমারের। এই ছেলেই পরে হয়েছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী।

স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের বিলেতে রেখে কৃষ্ণধন অল্পদিন পরেই একা দেশে ফিরে এলেন। তার কিছুদিন পরে তাঁর স্ত্রী স্বর্ণলতাও চলে এলেন ভারতে। সঙ্গে নিয়ে এলেন শিশুপুত্র বারীন্দ্র ও মেয়ে সরোজিনীকে। বিলেতে রইলেন বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ।

ম্যাঞ্চেস্টারে এক ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে ডাঃ ঘোষের বিশেষ পরিচয় ছিল। সেই বাড়িতে থেকেই ছেলেরা পড়াশোনা করতে লাগলেন।

অরবিন্দ প্রথমে ম্যাঞ্চেস্টারে গ্রামার স্কুলে ভরতি হলেন। সেখানে পড়াশোনা করলেন পাঁচ বছর।

তিনি ছেলেবেলাতেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা খুব ভালভাবে শিখেছিলেন। পরে নিজের চেষ্টায় ইতালীয় ও জার্মান ভাষা কী সুন্দর ভাবেই না আয়ত্ত করেছিলেন! তাই ইতালীয় কবি দান্তে ও জার্মান কবি গ্যাটের মহাকাব্য পাঠ করে তার রসাস্বাদন করবার সৌভাগ্য তাঁর অল্পবয়সেই হয়েছিল।

অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র তের বছর সেই সময়ে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট পলস্ স্কুলে ভরতি হলেন।

এই সেণ্ট পলস্ স্কুলে ভরতি হওয়ারও একটি কারণ রয়েছে।

ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁরা যে পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করতেন, সেই পরিবারের নাম ড্রুইড পরিবার। এই পরিবারেরই আত্মীয় অক্রয়েড পরিবারের বাড়িতে অরবিন্দ ঘন ঘন যাতায়াত করতেন।

সেই সূত্রে সেই পরিবারের সঙ্গেও অরবিন্দের এত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল যে সেখানে অরবিন্দের নাম হয়েছিল 'অরবিন্দ অক্রয়েড ঘোষ'। বিলেতে তিনি ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। এমন কি দেশে ফিরে আসার পরও কিছুদিন তাঁর ঐ নামেই চিঠিপত্র আসত। পরে তিনি ঐ বিজাতীয় নামের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন।

অরবিন্দ ড্রুইড পরিবারে বেশ শান্তিতে ও আনন্দেই ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সেই পরিবারের সবাই অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেলেন। তখন ম্যাঞ্চেস্টারে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। বাধ্য হয়ে তিনি ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লণ্ডনে চলে গেলেন এবং সেখানকার সেণ্ট পলস্ স্কুলে ভরতি হলেন।

এখানেও তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা এবং সুমধুর চরিত্রগুণ সকলকে মুগ্ধ করল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। পাঁচ বছর পড়াশোনা করার পর কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেন। শুধু তাই নয়, এই পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পেলেন চল্লিশ পাউণ্ড।

এরপর অরবিন্দ ভরতি হলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কিংস কলেজে। সেখানেও দু'বছর পরে ট্রাইপোজ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন।

ডাক্তার কৃষ্ণধন ছিলেন সাহেবী মেজাজের লোক। তাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা হল পুত্র অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করুক, তারপর ভারতে এসে একটা জেলার হর্তাকর্তা-বিধাতা হয়ে বসুক।

তখনকার দিনে আই. সি. এস. হওয়া সহজ কথা ছিল না। ভারতবাসীদের পক্ষে এই পদটি ছিল পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

কৃষ্ণধন চিঠি লিখলেন অরবিন্দের কাছে—"তুমি আই. সি. এস. হও, এই আমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা আছে তো?"

পিতার অনুরোধ শুনে অরবিন্দও রাজী হয়ে গেলেন। কিংস কলেজে অধ্যয়নকালেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তিনি তৈরী হতে লাগলেন।

১৮৯০ সালে অরবিন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর।

পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল, এই আঠারো বছরের ভারতীয় তরুণ পরীক্ষায় ভাল ভাবে তো পাস করেছেনই, তার ওপর করেছেন চতুর্থ স্থান অধিকার।

আরও আশ্চর্যের কথা, এই পরীক্ষায় অরবিন্দ গ্রীক ও লাটিন ভাষায় এত নম্বর পেয়েছেন যে এর আগে এই পরীক্ষায় আর কেউ এত নম্বর পান নি।

তখনই বিদেশী ছাত্রদের দৃষ্টি পড়ল এদিকে। কে এই ভারতীয় তরুণ.....এমন অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী?

ভারত সম্বন্ধে যে বিরূপ ধারণা ছিল বিদেশীদের, তার পরিবর্তন হতে লাগল ধীরে ধীরে। অজান্তেই যেন তাদের মাথা নত হল ভারতের কাছে।

অরবিন্দ বিদেশী ভাষায় এমন অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন, অথচ নিজের মাতৃভাষাতে রয়ে গেলেন কাঁচা। বিদেশী ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে মিলে মিশে বিদেশী ভাষার চর্চা করতে করতে বাংলা ভাষায় কথা পর্যন্ত বলতে ভুলে গেলেন তিনি। অবশ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময় তাঁকে বাধ্য হয়ে কিছু কিছু বাংলা শিখতে হয়।

এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে অরবিন্দের জীবনে পরবর্তী কালে ঘটেছিল এক বিচিত্র ঘটনা!

যে বছর তিনি এই পরীক্ষায় পাস করেন সেই বছরই বীচক্রফ্‌ট নামে এক ইংরেজ যুবকও উত্তীর্ণ হন।

গ্রীক ও লাটিন ভাষায় অরবিন্দ হন প্রথম আর বীচক্রফ্‌ট হন দ্বিতীয়।

কালের কী বিচিত্র গতি! আঠার বছর পরে যখন অরবিন্দ 'আলিপুর বোমার মামলা'র আসামীরূপে অভিযুক্ত হন তখন সেই বীচক্রফ্‌টই বসেছিলেন বিচারকের আসনে, আর অরবিন্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন আসামীর কাঠগড়ায়।

কেন এমন হল? কী বিচিত্র কালের চক্র রচনা করেছিল এই ইতিহাস!

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন অরবিন্দ। কিন্তু ডিগ্রী পেতে হলে দু'বছর শিক্ষানবিস থাকতে হবে। তারপর দিতে হবে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা।

অরবিন্দ দু'বছর শিক্ষানবিস রইলেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা আর দিতে পারলেন না।

তখন ঘটল এক বিচিত্র ব্যাপার।

পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি থেকে বের হলেন অরবিন্দ।

গন্তব্যপথের দিকে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু পা যেন আর চলে না।

একটি অলৌকিক শক্তি যেন তাঁকে বাধা দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন অরবিন্দ। ক্ষণিকের জন্য চলবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললেন।

অরবিন্দ মনে প্রাণে যেন অনুভব করতে লাগলেন, আই. সি. এস. অপেক্ষাও অধিকতর যশের মালা ও কীর্তির মুকুট নিয়ে দেশমাতা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

তাঁর মনের অবস্থা বদলে গেল, ধীরে ধীরে আবার বাড়ির দিকেই ফিরে চললেন তিনি।

ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা দেওয়া আর হল না।

স্বাধীনতার পূজারী অরবিন্দের মনে দ্বন্দ্ব শুরু হল। আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করে তিনি কি সত্যি হবেন একজন উচ্চ রাজকর্মচারী—'সিভিলিয়ান'।

কিন্তু তাতে কী হবে তাঁর? জীবনের স্বাধীনতা ব্যাহত হবে, সরকারী কাজের বাধ্যবাধকতার নাগপাশে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসবে।

ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা দিলেন না অরবিন্দ। ঘোড়ায় আর কোনদিন তিনি চড়েননি।

ঘোড়ায় চড়তে অনভ্যস্ত ছিলেন বলেই কি সেই পরীক্ষা দিতে রাজী হননি তিনি? অনেকে হয়তো তাই মনে করবেন।

কিন্তু সে কথা ভুল। অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস. শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত অরবিন্দ সম্বন্ধে যে একটি সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তা বিচার করলে অরবিন্দের ওপর কোন ভুল ধারণাই মানুষের থাকত না। একেবারে অনভ্যস্ত ব্যাপারেও অরবিন্দ কিরূপ দক্ষতা দেখাতে পারেন এই ঘটনাতে তারই পরিচয় রয়েছে।

চারুচন্দ্র এক সময়ে থাকতেন বোম্বাই-এর একটি শহর—ঠানার একটি বাড়িতে। তিনি তখন সেখানে জজিয়তি করতেন।

অরবিন্দ একদিন হঠাৎ সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সেদিন ভয়ানক বৃষ্টি, কারুর বাইরে বেরুবার উপায় ছিল না।

সবাই মিলে একটা ছোট রাইফেল নিয়ে বারান্দায় আমোদ করতে লাগলেন।

দূরে বসিয়ে দেওয়া হল একটা দেশলাইয়ের কাঠি। বারুদ মাখানো ছোট্ট মাথাটি হল লক্ষ্যবস্তু।

একে একে সবাই নিশানা করতে লাগলেন। কিন্তু কারুর নিশানাই ঠিক হল না। অমন একটি ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠির মাথায় কেউ রাইফেলের গুলি লাগাতে পারলেন না।

সবাই যখন ব্যর্থ হলেন তখন এল অরবিন্দের পালা। চারুচন্দ্র বললেন—আসুন ঘোষ সাহেব, আপনিও হিট্ করুন।

অরবিন্দ হেসে উঠলেন।—আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? আমি জীবনে কখনো বন্দুক হাতে ধরিনি।

কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। একজন বললেন—বন্দুক ধরেননি, তাতে কি হয়েছে? এটা তো আর আই. সি. এস. পরীক্ষার মহড়া হচ্ছে না।

একথায় উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন সকলেই। অরবিন্দও সেই হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলেন না। অবশেষে তাঁকেও নিশানা করবার জন্য উঠতে হল।

হাতে রাইফেল ধরলেন অরবিন্দ। প্রথম শুধু একটু দেখিয়ে দিতে হল কিভাবে নিশানা করতে হবে। ব্যস, তারপর আর কিছুই বলতে হল না। প্রথম বারেই লক্ষ্য ভেদ করলেন অরবিন্দ। তারপর আবার—তারপর আবার।

জোর হাতে তালি দিয়ে উঠলেন সকলে।

শাবাশ অরবিন্দ!

তার অনেককাল পরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত অরবিন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন—এমন লোকের যোগসিদ্ধি হবে না তো কি তোমার আমার হবে!

দুঃখের সাধনা

কৈশোর ও যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বিড়ম্বনায়, কি দারুণ অভাব ও দৈহিক ক্লেশ সহ্য করেছেন সে খবর ক'জন লোকে জানে?

বিলেতে পড়বার সময় অনেক দিন তাঁকে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হয়েছে।

এর প্রধান একটি কারণ ছিল পিতা কৃষ্ণধনের উদাসীনতা। এদেশ থেকে বিদেশে টাকা পাঠাতে অনেক সময়েই তিনি দেরি করেছেন। কোন সময় নানা গোলযোগের জন্য টাকা পৌছতেও দেরি হয়েছে।

কাজেই এমন অনেক দিন গিয়েছে যে অরবিন্দ দু-একখানি স্যাণ্ডউইচ খেয়েই দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তিনি মোটেই দুঃখ বোধ করেননি, অভিভূত হয়ে ভেঙেও পড়েননি। পাঠাগারের পুস্তকরাজির মধ্যে নিমগ্ন থেকে তিনি বাইরের সব কিছুকে ভুলে থাকতেন।

পিতার উদাসীনতাই যে শুধু অরবিন্দের এই দুঃখের কারণ ছিল তা নয়। কৃষ্ণধন ছিলেন অতি দয়ালু ও দানশীল। দরিদ্রের দুঃখে সর্বদা তাঁর হৃদয় বিগলিত হত। সেজন্য তাঁর দানের কোন সীমা ছিল না।

হয়তো বিলেতে ছেলেদের খরচ পাঠাবার জন্য টাকা ঠিক করে রেখেছেন, এমন সময় কোন গরিব লোক এল সাহায্যের জন্য।

অতি অসহায় লোক। এমন ভাবে তার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করল যে কৃষ্ণধনের মন গলে গেল। ছেলেদের খরচের সম্পূর্ণ টাকাই তিনি তুলে দিলেন সেই লোকটির হাতে।

ভাবলেন, বিলেতে টাকা কয়েকদিন পরে পাঠালেও চলবে।

কিন্তু সময়মত টাকা আর হাতে এল না।

এমন হয়েছে, কৃষ্ণধন দীর্ঘকাল অরবিন্দ ও তাঁর বড় ভাইদের খরচপত্র পাঠাননি। তখন তাঁদের ঋণের পর ঋণ করে দিন কাটাতে হয়েছে। বিদেশ বিভুঁয়ে তাতে কত সময় কত অসুবিধায় পড়তে হয়েছে অরবিন্দকে এবং তাঁর ভাইদেরও।

এদিকে ডাঃ কৃষ্ণধনের হয়তো কর্মস্থল হতে অন্যত্র বদলি হবার সময় উপস্থিত হল, অমনি সেখানকার গরিব লোকদের মধ্যে পড়ে গেল কান্নার রোল। কারণ কৃষ্ণধনের সাহায্য থেকে এবার তাদের বঞ্চিত হতে হবে।

এমনি ছিল কৃষ্ণধনের বদান্যতা। আর সেইজন্যই অরবিন্দকে বিলেতে কত সময় কত কষ্ট করতে হয়েছে।

অরবিন্দ কেন আই. সি. এস. হতে পারেননি সে সম্বন্ধে আবার তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার অন্য ধরনের কথা বলেছেন! তিনি 'আমার আত্মকথা' নামক পুস্তকে লিখেছেন—

"সেখানে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক আলোচনা সভা ছিল, তার নাম ছিল 'মজলিস'। এই সভায় গরম গরম রাজনীতিক বক্তৃতা দেওয়ায় অরবিন্দ সেই বয়সেই ইংরেজ সরকারের 'সুনজরে' পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেখানে অরবিন্দের সমসাময়িক। আই. সি. এস. পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সঙ্গে পাস করেও তুচ্ছ ঘোড়াচড়ার অজুহাতে যে তাঁকে অকৃতকার্য বিবেচনা করা হল তার

কারণ খুব সম্ভব ইংরেজ সরকারের সেই 'সুনজর'। সেই সময়ে এ নিয়ে ভারতে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হয়েছিল।"

অরবিন্দ যে আই. সি. এস. হতে পারেননি, তা ভারতের প্রতি বিধাতার এক শুভ আশীর্বাদ। তিনি যদি সিভিল সার্ভিস পাস করে সরকারী চাকরি পেতেন, তবে আমরা কোন্ অরবিন্দকে পেতাম?

তিনি অবশ্যই নিজের অসামান্য প্রতিভাবলে বহু গালভরা উপাধি লাভ করতেন এবং রাজসম্মানে বিভূষিত হতে পারতেন, কিন্তু তাহলে কি ভারত আজ ঋষি অরবিন্দকে পেত?

বিধাতা তাঁকে পাঠিয়েছেন দাসত্বের দ্বারা নিজের নাম কেনবার জন্য নয়, তাঁকে পাঠিয়েছেন এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে শিক্ষাদানের জন্য, তাঁকে পাঠিয়েছেন সারা জগতের মানুষের কল্যাণের জন্য, তাঁকে পাঠিয়েছেন ভারতের ভবিষ্যৎ ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

বিলেতে বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও বিলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়ে অরবিন্দকে সাত বছর থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটাতে হয়। এই দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তাঁর কাটে বিদেশী আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যে বয়সে অনুকরণের লোভ মানুষকে পেয়ে বসে, সেই বয়সেই অত দীর্ঘকাল বিজাতীয় সভ্যতা ও আদর্শের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও অরবিন্দের হৃদয়ে তা বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি।

এতকাল ধরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, দর্শন গভীর আগ্রহের সঙ্গে আয়ত্ত করে সহসা তাঁর মনে হল বুঝি সবই বৃথা।

অরবিন্দের মনে কী যেন এক ভাবের উদয় হল!

ভারতের সন্তান হয়ে ভারতীয় শিক্ষা-সাধনা ও ধ্যান-ধারণার আজও সন্ধান পেলাম না।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শন—সব কিছুই পড়ে রইল মনের গহন অন্ধকারে।

তবে পেলাম কী? শিখলাম কী?

মায়ের সঙ্গে সন্তানের পরিচয় ঘটল না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে!

অরবিন্দের মন যেন ধিক্কারে ভরে উঠল। ছিঃ ছিঃ, আমার জীবনই যে বৃথা!

পড়ে রইল বিদেশী শিক্ষা ও আচার-নীতির মোহ। পড়ে রইল বিদেশী খেতাব।

অরবিন্দ দেশে ফিরে এলেন।

বিদেশীয় জ্ঞান-রত্ন যা আহরণ করেছিলেন—শুধু তা-ই বহন করে নিয়ে এলেন মনের মণিকোঠায়। বাহ্যিক আড়ম্বর, বিদেশীয় ভাবধারা, উৎকট বিলাসিতা সব কিছু পেছনে পড়ে রইল।

ভাইদের মধ্যে অরবিন্দই প্রথম দেশে ফিরলেন। কিছুদিন পরে এলেন জ্যেষ্ঠ বিনয়ভূষণ, তারপর এলেন মনোমোহন।

কিন্তু কী দুর্দৈব!

অরবিন্দ দেশের মাটিতে পা দিয়েই শুনতে পেলেন তাঁর পিতা আর ইহলোকে নেই।

'অরবিন্দ' নাম উচ্চারণ করতে করতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাঁর পরম স্নেহময় পিতা কৃষ্ণধন।

মনে দুঃখের অবধি রইল না অরবিন্দের।

পিতার মৃত্যুর জন্য যেন তিনিই দায়ী।

বড় আশা করেই অরবিন্দকে কৃষ্ণধন বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। ছেলে আই. সি. এস. হয়ে ফিরে আসবে। জাঁদরেল অফিসার হয়ে বসবে দেশের বিরাট এক সম্মানের আসনে।

কিন্তু কি হতে কি হয়ে গেল। আই. সি. এস. হতে পারলেন না অরবিন্দ।

সেই থেকে কৃষ্ণধনের মন ভেঙে পড়ল। কিন্তু ছেলের ওপর বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং অরবিন্দ দেশে ফিরে আসছেন, সেই সংবাদে তিনি অধীর আগ্রহে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

সেই সময় সহসা এমন এক ব্যাপার ঘটল, যার ফল হল অতি শোচনীয় ও মর্মান্তিক।

ডাক্তার কৃষ্ণধন শুনেছিলেন, অরবিন্দ বিলেত থেকে জাহাজে করে ভারতবর্ষে আসছেন।

যে জাহাজে অরবিন্দ আসবেন, সেই জাহাজের নামটিও তিনি জেনে নিলেন।

তারপর থেকে সেই জাহাজের গতিবিধি সম্বন্ধে নিয়মিত খোঁজখবর করতে লাগলেন কৃষ্ণধন। কবে নাগাদ জাহাজটি ভারতের উপকূলে এসে ভিড়বে সে খবরও জানতে পারলেন।

কিন্তু হায়, এত প্রত্যাশার স্বপ্ন সহসা গেল ভেঙে!

দৈবাৎ সেই জাহাজে ঘটল এক দুর্ঘটনা।

লিসবন বন্দরের কাছে এসে জাহাজখানি সাগরের জলে ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের শত শত আরোহী সকলেই জলে ডুবে প্রাণ হারালেন।

সেই খবর শুনে কৃষ্ণধন আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না। আর্তনাদ করে তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেতনা লোপ পেল।

কিন্তু হায়, তিনি জানতেন না, এমন অকালে মৃত্যুর কোলে

ঢলে পড়বার জন্য অরবিন্দ আসেননি। এত তাড়াতাড়ি তাঁর মৃত্যু হতে পারে না। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে নতুন কীর্তির জয়রথ।

যে জাহাজের নাম কৃষ্ণধন শুনেছিলেন, সে জাহাজে অরবিন্দ রওনা হননি। তিনি রওনা হয়েছিলেন অন্য জাহাজে।

হয়তো এতেও ছিল বিধাতার কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত।

কিন্তু কৃষ্ণধন সে কথা জানতে পারলেন না।

সেই যে তিনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন, তারপর আর বেশীদিন বাঁচলেন না। অরবিন্দের নাম উচ্চারণ করতে করতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

কর্মজীবন

দেশের ছেলে দেশে ফিরলেন। বিলেতে এতদিন থেকেও তিনি সাহেব হতে পারেননি। কিন্তু মাতৃভাষা সবই গিয়েছেন ভুলে।

যে অরবিন্দকে তাঁর পিতামাতা চেয়েছিলেন, ইনি সেই অরবিন্দ নন।

পিতা পরলোকে, মাতার দেহ ও মন সুস্থ নয়। কিন্তু মাতামহ রাজনারায়ণ অরবিন্দকে দেখে খুবই খুশী হলেন। তিনি অরবিন্দের মধ্যে যেন একটি নতুন রূপ দেখতে পেলেন—শান্ত সৌম্য পাণ্ডিত্যের প্রতিমূর্তি। প্রতিভাবান্ অরবিন্দ।

অরবিন্দ ও তাঁর দুই ভাই ভারতে ফিরে আসার অল্পদিন পরেই ভাল ভাল চাকরি পেলেন। বিনয়ভূষণ কাজ নিলেন কোচবিহার রাজ্যে, আর মনোমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করলেন। অরবিন্দের নিজের কর্মক্ষেত্র হল বরোদা রাজ্য।

বিলেতে যখন অরবিন্দের শিক্ষাজীবন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন বরোদার গায়কোয়াড় লণ্ডনে ছিলেন। অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সেই সূত্রে এবার দেখা করলেন গায়কোয়াড়ের সঙ্গে।

আগুন কখনও চাপা থাকে না।

গায়কোয়াড় সয়াজি রাও অরবিন্দের গুণের পরিচয় পেয়ে বিশেষ প্রীত হলেন। তাই সাদরে এই বাঙালী যুবকটিকে তিনি তাঁর রাজ্যের সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করলেন।

অরবিন্দ প্রথমে সেট্‌ল্‌মেণ্ট ও পরে রাজস্ব বিভাগে কাজ করেন। সেই সময়ে তাঁকে গায়কোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজও কিছু কিছু করতে হত।

কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন ভিন্ন ছাঁচে গড়া মানুষ। যিনি আই-সি-এস উপাধি হেলায় তুচ্ছ করেছেন, তাঁর কাছে এই সব চাকরি ভাল লাগবে কেন?

বিলেতে বিদেশী শিক্ষা দীক্ষা ও জাঁকজমকের ভেতর যে শিক্ষাকে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছিলেন—এখানে এসেও তাই খুঁজতে লাগলেন।

সিভিল সার্ভিসের চাকরি অরবিন্দের কাছে ভাল লাগল না। তাই সে কাজ ছেড়ে দিলেন। বরোদার শিক্ষা বিভাগে যোগদান করে নিলেন শিক্ষাব্রত।

অরবিন্দের বয়স তখন একুশ বাইশ। দেহে নব যৌবনের ডাক। যে ডাকে মানুষ হয় চঞ্চল, যে ডাকে সবাই হয়ে ওঠে আত্মসুখপরায়ণ, সে ডাক একটুও বিচলিত করল ন অরবিন্দকে। বই হল তাঁর জীবন, জ্ঞানরত্ন আহরণের চেষ্টা হল তাঁর সাধনা।

কেবল চিনতেন পুস্তক, আর চেষ্টা ছিল কেবল জ্ঞানরত্ন আহরণের।

ব্যবহারিক কর্মপটুতা তখনও অর্জিত হয়নি অরবিন্দের। সামাজিক জীবনে তখনও তিনি অনভিজ্ঞ। অথচ সেই জ্ঞান তপস্বীর সংস্পর্শে যে এসেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে অনেক বর্ষীয়ানকেও।

অরবিন্দ বরোদা কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। পেলেন তিনি জ্ঞানচর্চার উত্তম সুযোগ।

অধ্যাপক জীবনের প্রথম কিছুকাল অরবিন্দ ছাত্রদের কাছে

যে বক্তৃতা দিতেন তা ছাত্রদের বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হত। কারণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষায় অভ্যস্ত তিনি, তাঁর পড়াবার ধরনও ছিল পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুযায়ী। তাঁর উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সাধারণ জিনিসের মধ্যেও প্রতিফলিত হত স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে। তাই ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে তা অনুধাবন করা কষ্টকর হত।

যা হোক্, খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি সে-সব অসুবিধা কাটিয়ে উঠলেন এবং একজন দক্ষ অধ্যাপক রূপে অচিরেই করলেন সুনাম অর্জন।

১৮৯৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বরোদায় ছিলেন। এই তেরো বছর বরোদার নির্জনতায় জ্ঞানসাগরে অমূল্য রত্নের সন্ধানে তিনি ডুবে রইলেন।

ইওরোপের কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের আস্বাদ তিনি আগেই পেয়েছিলেন। তবু তার চর্চা আবার করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারে মনোনিবেশ করলেন।

বিলেতে থাকতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অরবিন্দের অতি সামান্যই অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে এসে তিনি অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই অরবিন্দ বাংলা ভাষায় এতটা উন্নতিলাভ করলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ কাব্য" বুঝতে তাঁর কোন অসুবিধাই হত না।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ক্রমশঃ তিনি এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, পরে তিনি 'ধর্ম' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

অরবিন্দকে বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় ১৮৯৮ সালে বরোদায় যান।

অরবিন্দের মাতুল যোগীন্দ্রনাথ বসুই এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

অরবিন্দের নাম দীনেন্দ্রকুমার লোকমুখে অনেক শুনেছিলেন, কিন্তু চোখে কখনও দেখেননি। যেদিন প্রথম দেখেন, তার মাত্র দিনকয়েক আগে অরবিন্দ বিলেত থেকে ফিরেছেন।

প্রথম সাক্ষাতেই দীনেন্দ্রবাবু ভয়ানক নিরাশ হলেন।

এই কি অরবিন্দ! সারা ভারতে যাঁর নাম নিয়ে কিছুকাল আগেও এত তোলপাড় হয়েছে—এই কি তাঁর চেহারা।

মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চোখে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ, ক্ষীণ দেহধারী এক যুবক।

পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতো, পরনে আমেদাবাদ মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা খাদি, গায়ে আঁটা মিরজাই, মাথায় বাবরিকাটা পাতলা চুল, মাঝখানে চেরা সিঁথি।

দীনেন্দ্রকুমার ভেবেছিলেন বিলেতফেরত এক সাহেবকেই দেখতে পাবেন তিনি। কিন্তু এ তাঁর কি রূপ!

ইংরেজী, ফরাসী, লাটিন ও গ্রীকের সজীব ফোয়ারা এই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

দেওঘরের পাহাড় দেখিয়ে যদি কেউ বলত 'এ হিমালয়' তা হলেও বোধ হয় অতটা বিস্মিত ও হতাশ তিনি হতেন না।

কিন্তু একি!

যা হোক, দু এক দিনের মধ্যেই দীনেন্দ্রকুমারের মনের ও মতের পরিবর্তন হল।

অরবিন্দের সঙ্গে দু এক দিনের ব্যবহারেই বুঝতে পারলেন তাঁর হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নেই। তাঁর হাসি শিশুর মত সরল, তরল ও মধুর।

হৃদয়ের অটল সংকল্প যেন ওষ্ঠপ্রান্তে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু তাতে নেই মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশ; মানব-দুঃখে আত্মবিসর্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা যেন তাতে পরিস্ফুটমান।

যতই দিন যেতে লাগল ততই দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পেতে লাগলেন। ততই বুঝতে পারলেন, অরবিন্দ এ পৃথিবীর মানুষ নন, শাপভ্রষ্ট দেবতা।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় জ্ঞানলাভ করে অরবিন্দ ভারতীয় কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি যতই পড়তে লাগলেন, ততই ভারতের জ্ঞান-গরিমার প্রতি তিনি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখে গিয়েছেন তাঁর 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে।

তিনি বলেছেন—এমন অদ্ভুত পাঠানুরাগ আমি আর কারুর মাঝে দেখিনি।

অরবিন্দের বই খুব কমই বুকপোস্টে আসত। তাঁর বই আসত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্সে বোঝাই হয়ে রেল পার্শ্বেলে। অমন পার্শ্বেল মাসে দু তিন বারও আসত।

এমন বই পড়ার বাতিক ছিল অরবিন্দের যে একটি রেল পার্শ্বেলের বই আট দশ দিনের মধ্যেই পড়া শেষ হয়ে যেত। আবার অর্ডার দিতেন নতুন বইয়ের জন্য।

অরবিন্দ বরোদায় যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। যদিও সরকার থেকেই তা বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

 Acc. no. — 16825

এমন কদর্য ঘরে বাস করতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র আপত্তি ব কুণ্ঠা ছিল না। নির্বিকারচিত্তে অরবিন্দ দিনের পর দিন ঐ ঘরটিতে কাটিয়েছেন।

অরবিন্দ রাত একটা পর্যন্ত উৎকট মশার কামড় উপেক্ষা করে টেবিলের ধারে একটি চেয়ারে বসে পড়াশোনা করতেন।

টেবিলের ওপর জ্বলত একটি জুয়েল ল্যাম্প।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইয়ের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য, যেন যোগনিমগ্ন তপস্বী।

ঘরে আগুন লাগলেও বোধ হয় তাঁর হুঁশ হত না।

এইভাবে কাটত রাতের পর রাত।

এমন নিদারুণ কষ্ট করেই চলত তাঁর জ্ঞানের সাধনা।

ইওরোপের নানা ভাষায় কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস ও দর্শন যে তিনি পাঠ করতেন তার কোন সংখ্যা ছিল না।

অরবিন্দের পাঠাগারে ইওরোপের নানা ভাষার নানা গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরেজী, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের বই—তার হিসেব রাখাও কঠিন ছিল।

চসার থেকে সুইনবার্ন পর্যন্ত সব ইংরেজ কবির কাব্যগ্রন্থ সঞ্চিত ছিল তাঁর পাঠাগারে। অসংখ্য ইংরেজী উপন্যাস আলমারিতে ঘরের কোণে ও স্টীলট্রাঙ্কে ছিল বোঝাই-করা।

হোমারের ইলিয়াড আর দান্তের মহাকাব্য থেকে শুরু করে বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত আর কালিদাসের মহাকাব্য—কোন কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর অমূল্য গ্রন্থভাণ্ডারে।

প্রাচীন মহাকাব্যের প্রতি অরবিন্দের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল খুব বেশী।

ব্যাস অপেক্ষা আদিকবি বাল্মীকি ছিলেন তাঁর অধিক শ্রদ্ধাভাজন।

তাই অরবিন্দ বলেছিলেন—বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্যও নেই পৃথিবীতে।

মহাকবি দান্তের কবিত্বে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, হোমারের ইলিয়াড পাঠে পেয়েছিলেন অফুরন্ত আনন্দ।

অরবিন্দ বলতেন—ইওরোপীয় সাহিত্যে এঁদের তুলনা কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দের ওপর ছিল অরবিন্দের গভীর শ্রদ্ধা। তিনি যখনই সময় পেতেন মন দিয়ে তাঁদের লেখা পড়তেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়ে মুগ্ধ হতেন। অচলায়তনের যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে এসেছেন এক চলমান জগতে—বদ্ধ নদীর স্রোতোধারাকে করেছেন প্রবাহিত।

অরবিন্দ বলতেন—বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্তমানের ব্যবধানের উপর সুবর্ণসেতু।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনা অতি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন অরবিন্দ। তাঁর রচনা পাঠ করে তিনি লাভ করতেন মনে গভীর অনুপ্রেরণা। বলতেন—স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষায় ভাবের এরূপ ঝংকার, শক্তি ও তেজ খুব কমই আমি দেখেছি।

* * *

জ্যোতিষশাস্ত্রে ছিল অরবিন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস। মানব-জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে, তা তিনি স্বীকার করতেন। কোষ্ঠীপত্র দেখে জাতকের জীবনের শুভাশুভ জানতে পারা যায়, এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

অরবিন্দ মারাঠী ভাষাও শিখেছিলেন, কিন্তু ভাল বলতে পারতেন না। তবে বাংলার চেয়ে ভাল বলতে পারতেন।

বিভিন্ন ভাষায় ভাল জ্ঞান ছিল বলেই বিশেষ কোন ছাত্রের কোন জটিল প্রশ্নের জবাব দিতে অরবিন্দের অসুবিধা হত না। তা ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা সরল ভাবে সব কিছু বুঝে নিতে পারত।

অরবিন্দের প্রতিভা, অরবিন্দের চরিত্র-মাধুর্য সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল সমগ্র ছাত্রসমাজকে।

শিক্ষার্থীরাও এরূপ মহাপ্রাণ উদারহৃদয় ক্ষমাশীল অধ্যাপক লাভ করে নিজেদের ধন্য মনে করত।

দীনেন্দ্রকুমার বলেছেন—"বরোদার ইতর-ভদ্র সকলেই মিঃ ঘোষের নাম জানত। যারা তাঁকে চিনত, তারা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

বরোদার শিক্ষিত সমাজ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্মান করতেন। মারাঠা সমাজে অরবিন্দ লাভ করেছিলেন দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা। কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের চেয়েও বাঙালী অধ্যাপক অরবিন্দ ছাত্রসমাজের অধিকতর সম্মান ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। তাঁর অধ্যাপনার প্রণালীতে তারা মুগ্ধ হয়েছিল।"

অরবিন্দের প্রতি ছিল বরোদার মহারাজের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। অরবিন্দ যদিও কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তথাপি মহারাজ প্রায়ই এমন সব কাজে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন, যার সঙ্গে কলেজের অধ্যাপনার কোনও সংস্রব ছিল না।

মহারাজ তাঁকে যথেষ্ট ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, বিশ্বাস করেন—এই সুযোগ গ্রহণ করে অরবিন্দ কোন দিনই নিজের পদোন্নতির জন্য বা অন্য কারুর জন্য কিছু সুবিধা আদায় করে নেবার চেষ্টা করেননি।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আত্মসম্মানের মূল্য তিনি এত বেশী বলে মনে করতেন যে, কোনরূপেই তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণই হতে দিতেন না।

দীনেন্দ্রকুমার লিখেছেন—"আমার মনে হত, অরবিন্দকে মহারাজের অদেয় কিছুই ছিল না।"

একদিন কথায় কথায় দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—"এখানে দেখছি উচ্চপদস্থ কর্মচারী অনেক, তাঁদের মানসম্ভ্রমও অসাধারণ; আপনি একটু চেষ্টা করলেই এরূপ মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হতে পারেন। কত লোক তেলের ভাঁড় নিয়ে আপনার দরজায় ঘুরে বেড়ায়। তা না করে, আপনি সম্ভ্রান্ত সমাজের উপেক্ষা সঞ্চয় করে এভাবে একধারে পড়ে আছেন কেন?

অরবিন্দ হেসে জবাব দিলেন—মানসম্ভ্রম, ক্ষমতা-প্রতিপত্তিতেই যে সকলে সুখ পায়, এমন নয়। কতগুলো স্বার্থপর মূর্খের তোষামোদে কি কোন আনন্দ পাওয়া যায়?

দীনেন্দ্রকুমার জবাব শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, কেবল মূর্খের তোষামোদ নয়, পণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ-খোলা প্রশংসাতেও অরবিন্দ কখনো উৎফুল্ল হননি।

মহারাজ অরবিন্দকে চিনতেন, তাঁর মর্যাদা বুঝতেন। বুঝতেন তাঁর সুবিস্তীর্ণ কর্মশালায় মাসিক দু তিন হাজার টাকা বেতনের স্থূলোদর কর্মচারী অনেক আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অরবিন্দ সেখানে নেই।

এক একদিন সকালে বা বিকালে এক-একজন অস্ত্রধারী তুরুক-সোয়ার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ হতে অরবিন্দের কাছে হাজির হত। হাতে তার মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্র।

প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখেছেন—"আজ আপনি মহারাজের সঙ্গে ডিনারে যোগ দিলে তিনি বড়ই আপ্যায়িত হবেন।"

অরবিন্দ জবাব দিয়ে পাঠালেন—"দুঃখিত, আজ আমি মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না।"

ফিরে গেল তুরুক-সোয়ার।

আবার এল আর একদিন। সেদিনও তার হাতে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্র।

সেক্রেটারী লিখেছেন—"মহারাজের সঙ্গে অমুক সময়ে একবার আপনার সাক্ষাতের কি অবসর হবে?"

তারও জবাব দিয়েছেন অরবিন্দ—"দুঃখিত, আজ আমার হাতে একটুও সময় নেই।"

নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে তুরুক-সোয়ার।

একদিন নয়, অনেক দিন।

কিন্তু মিথ্যা অজুহাতে একদিনও মহারাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেননি অরবিন্দ। সে ধরনের লোকই তিনি ছিলেন না। সময়ের অভাববশতঃই মহারাজের আমন্ত্রণ বা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এটাও কম বিচিত্র ব্যাপার নয়। কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহারাজের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের জন্য মাসের পর মাস উমেদারী করে বেড়ান। অনেক কষ্টে তাঁদের ভাগ্যে মহারাজের দেখা মেলে।

আর সামান্য শিক্ষক অরবিন্দ মহারাজের প্রসাদ অপেক্ষা কর্তব্যকেই অধিক মূল্যবান্ মনে করেন।

অরবিন্দ বরোদায় প্রায় এক হাজার টাকা বেতন পেতেন। তাতে একক জীবনে তিনি যথেষ্ট বিলাসিতা করতে পারতেন।

কিন্তু বিলাসিতা দূরের কথা তিনি জীবন যাপন করতেন অতি সাধারণ মানুষের মত। বাস্তবপক্ষে তিনি সংসার ত্যাগ না করেও ছিলেন সন্ন্যাসী।

সাজপোশাকের কখনও পক্ষপাতী ছিলেন না অরবিন্দ। বিলাসিতার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল না। সাধারণ কাপড়জামা পরেই তিনি গিয়ে হাজির হতেন রাজদরবারে।

যেন এক আত্মভোলা মানুষ।

দামী জুতা, জামা, টাই, কলার, ফ্লানেল. লিনেন, পঞ্চাশ রকম আকারের কোট, হ্যাট, ক্যাপ—এসব তাঁর কিছুই ছিল না।

কোন দিন তাঁকে হ্যাট ব্যবহার করতে কেউ দেখেনি। যে টুপিগুলি এদেশে 'পিরালী টুপি' নামে সাধারণতঃ পরিচিত, তিনি তাই ব্যবহার করতেন।

তাঁর শয্যাও ছিল অতি আড়ম্বরহীন। যে একটি লোহার খাটিয়ায় তিনি শয়ন করতেন, ত্রিশ টাকা বেতনভোগী কর্মচারীও সে খাটিয়ায় শয়ন করা অগৌরবের বিষয় মনে করতো।

কোমল ও নরম বিছানা বা আরও শুদ্ধ ভাষায় যাকে দুগ্ধ-ফেনোনিভ শয্যা বলা হয়, তাতে শয়ন করার কথা অরবিন্দ কল্পনাতেও স্থান দিতেন না।

বরোদা ছিল মরু অঞ্চলের কাছাকাছি জায়গা। তাই সেখানে শীত গ্রীষ্ম দুই ঋতুই ছিল অত্যন্ত প্রবল।

কিন্তু মাঘ মাসের শীতেও অরবিন্দকে কেউ কোনদিন লেপ ব্যবহার করতে দেখেনি।

'কম্বলবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'—অরবিন্দ অল্পমূল্যের সাধারণ কম্বলেই লেপের অভাব পূরণ করতেন। পাঁচ সাত টাকা দামের একটি নীল রঙের আলোয়ানই ছিল তাঁর প্রধান শীতবস্ত্র।

দীনেন্দ্রকুমার বলেছিলেন—"যত দিন অরবিন্দের সঙ্গে বাস করেছি, তাঁকে ব্রহ্মচর্যনিরত, পরদুঃখকাতর, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ছাড়া আর কিছু মনে হত না। যেন জ্ঞানসঞ্চয়ই ছিল তাঁর

জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্মকোলাহলমুখরিত সংসারে থেকেও তিনি ছিলেন যেন কঠোর তপস্যায় মগ্ন।"

অরবিন্দ ছিলেন অত্যন্ত অল্পাহারী।

খাওয়ার দিকে কোন লোভ তাঁর ছিল না। অল্পহারী ও মিতাচারী ছিলেন বলেই গুরুতর মানসিক পরিশ্রমেও তাঁর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

স্বাস্থ্যের দিকে তাঁর লক্ষ্যও ছিল।

ব্যায়ামে তাঁর অনুরাগ ছিল না, তবে রোজ সন্ধ্যার আগে প্রায় একঘণ্টা বারান্দায় দ্রুত পায়চারি করতেন।

অরবিন্দের একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ি ছিল।

ঘোড়াটি ছিল খুব বড়, কিন্তু চলনে ছিল গাধার দাদা।

কষে চাবুক মারলেও ঘোড়াটির হুঁশ হত না। চলার গতিও বাড়তো না। গাড়িখানি যে কতকালের তা কেউ বলতে পারত না। তবু সেই গাড়িতেই কাজ চলে যেত অরবিন্দের।

'অল্প লইয়া থাকি' রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই নীতিই ছিল যেন অরবিন্দের জীবনধারণের নীতি।

অরবিন্দের সব কিছুই বিচিত্র।

যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, তেমনি গাড়ি, তেমনি বাড়ি। অথচ যে টাকা তাঁর বাড়ি ভাড়া লাগত, সেই টাকাতে কলকাতাতেও তখন ভাল বাড়ি পাওয়া যেত।

সংসার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলেই বোধ হয় সকলেই তাঁকে ঠকাত।

কিন্তু অর্থে যাঁর মমতা নেই, ঠকেও তাঁর অনুতপ্ত হবার অবকাশ ছিল না।

কবি অরবিন্দ

অরবিন্দ ছিলেন জন্মকবি।

চৌদ্দ বছর বয়সে লেখা তাঁর একটি ইংরেজী কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সেই কবিতাটি পড়ে সমালোচকরাও সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে কোন বাঙালী ছেলের হাত দিয়ে এমন কবিতা বেরুতে পারে? তা যেন অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি।

কিন্তু যা সত্য, তা কখনো চাপা থাকে না। দিনের সূর্যের মতই তা প্রকাশ পেতে থাকে।

বরোদায় এসে অরবিন্দ যেমন কাব্য পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন, তেমনি কাব্যচর্চাতেও দিয়েছিলেন মনোযোগ।

বিদ্যাচর্চার সঙ্গে চলল কাব্যচর্চা।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রতি ছিল অরবিন্দের অশেষ অনুরাগ। ইংরেজীতে একটি সনেট লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করেছিলেন।

ছোটবেলাতেই হয় অরবিন্দের মধ্যে কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ। সেই কাব্য-প্রতিভা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে তাঁর বরোদায় অবস্থান কালে নির্জন অবসরে একাগ্র সাধনার মধ্যে।

রামায়ণ ও মহাভারতের বহু উপাখ্যান অবলম্বনে তিনি ইংরেজীতে অনেক কবিতা রচনা করলেন। সেগুলি যেমন মধুর ছন্দে গ্রথিত তেমনই গভীর ভাব ও রসপূর্ণ।

একদিন একটি অতি আশ্চর্য ঘটনার মধ্য দিয়েই তাঁর সেই রচনার একটি নতুন পরিচয় পাওয়া গেল।

বিখ্যাত মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার।

মহারাজের নিমন্ত্রণে তিনি ১৮৯৯ সালের শেষের দিকে বরোদায় বেড়াতে গেলেন।

অরবিন্দের সঙ্গে দত্ত মহাশয়ের সম্ভবতঃ আগে আলাপ পরিচয় ছিল না। কিন্তু অরবিন্দের কবি-প্রতিভার কথা আগেই শুনেছিলেন। বোধ হয় তার কিছু কিছু পরিচয়ও পেয়েছিলেন।

রমেশচন্দ্র ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান লেখক। তা ছাড়া তিনি কবিতাও রচনা করতেন।

বিলেতে থাকতে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজী রচনা প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকদের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। গদ্যে. পদ্যে, উপন্যাসে, কাব্যে তাঁর সমান কলম চলত।

রমেশচন্দ্র শুনলেন, অরবিন্দও রামায়ণ এবং মহাভারতের স্থান-বিশেষের অনুবাদ করেছেন। তাই তিনি তা দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

এলেন অরবিন্দের ঘরে।

বললেন—অরবিন্দ, তুমি নাকি কবি হয়েছ?

লজ্জায় যেন সংকুচিত হয়ে পড়লেন অরবিন্দ।

রমেশচন্দ্র বললেন—"শুনেছি, তুমি রামায়ণ ও মহাভারতের কিছু কিছু ইংরেজী অনুবাদ করেছ? দাও তো দেখি, কি রকম হয়েছে?"

অরবিন্দ যেন আরও সংকুচিত হয়ে পড়লেন। বললেন—"আপনি এত সুন্দর অনুবাদ করেছেন রামায়ণ মহাভারতের, তার কাছে আমার এ অনুবাদ তো তুচ্ছ।"

—"না হে না, পৃথিবীতে কিছুই তুচ্ছ নয়। দেখি কি রকম লিখেছ ?"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অরবিন্দ তাঁর পাণ্ডুলিপি তুলে দিলেন রমেশচন্দ্রের হাতে।

রমেশচন্দ্র পড়তে লাগলেন।

প্রথমে এলোমেলো ভাবেই তু একটি পাতা পড়তে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই গভীর মনোযোগ দিলেন সে দিকে।

রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগলেন।

নিঃশব্দে ওলটাতে লাগলেন পাতার পর পাতা।

পড়া শেষ হল।

মুখ দিয়ে বের হল শুধু তুটি শব্দ—অদ্ভুত! চমৎকার!

অরবিন্দ অনেকটা অবাক হয়েই তাকালেন রমেশচন্দ্রের দিকে।

রমেশচন্দ্র বললেন—"তোমার এইসব কবিতা দেখে আমার মনে তুঃখ হচ্ছে। কেন আমি রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করে এত পরিশ্রম করেছি ?"

অরবিন্দ যেন কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। কৌতূহল ও সংশয় নিয়েই তাকিয়ে রইলেন রমেশচন্দ্রের মুখের দিকে।

রমেশচন্দ্র বললেন—"এখন মনে হচ্ছে আমি ছেলেখেলা করেছি।"

অরবিন্দ বললেন—"একি কথা বলছেন আপনি ? আপনার সেই অনুবাদের সমালোচনায় বিলেতের কাগজগুলো পর্যন্ত একদিন প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল!"

রমেশচন্দ্র বললেন—"হয়েছিল তা সত্যি। কিন্তু তোমার এ কাব্য আমার কাব্যের চেয়ে অনেক সুন্দর। তোমার এই লেখাগুলো দেখলে আমার লেখা কখনো ছাপতাম না।"

অকুণ্ঠ প্রশংসা করে ঘর থেকে উঠে গেলেন রমেশচন্দ্র। অরবিন্দ লক্ষ্য করলেন—যে রকম উজ্জ্বল ও হাসিমাখা মুখ নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, যাবার সময় অনেক তার পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের এত উল্লসিত প্রশংসাতেও অরবিন্দ উল্লসিত হয়ে ওঠেননি।

সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, নিন্দা-প্রশংসায় অরবিন্দ চিরদিন সমান নির্বিকার।

কি বিচিত্র যোগাযোগ! এ যেন শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথের গঙ্গা-বিহারের উপাখ্যান।

রঘুনাথ লিখেছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের টীকা। শ্রীচৈতন্যও লিখেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের টীকা শোনার পর রঘুনাথের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছিলেন—"তোমার এ টীকা আমার লেখা টীকা থেকেও অনেক সুন্দর—অনেক প্রাঞ্জল। তোমার এ গ্রন্থ প্রচারিত হলে আমার লেখা গ্রন্থ আর কেউ পড়বে না।"

তাতে বন্ধুত্বের হৃদয়ে পড়েছিল আঘাত। শ্রীচৈতন্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নিজের পাণ্ডুলিপি গঙ্গার জলে।

এ যেন সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। এক প্রতিভার কাছে আর এক প্রতিভার পরাজয়।

ভারতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রমেশচন্দ্র হার মানলেন অরবিন্দের কাছে। কারণ অরবিন্দের জন্য অপেক্ষা করছে ভাবীকালের মহাকীর্তির জয়রথ।

অরবিন্দ ইংরেজী কবিতা লিখতেন নানা ছন্দে। ভাষার

উপর অসাধারণ অধিকার না থাকলে ভাষাকে অমন ছন্দের দোলায় দোলাতে কেউ পারেন না।

অথচ তাঁর ইংরেজী কবিতাগুলি সরল ও মধুর; বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী! শব্দচয়নের ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসামান্য। শব্দের অপপ্রয়োগ কখনো তিনি করতেন না।

যা লিখতেন, অতি সহজ গতিতেই তা কলমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত। কাটাকাটি প্রায়ই তিনি করতেন না।

লেখবার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল তাঁর। চুরুট সিগারেট টানতে টানতে কিছুক্ষণ ভাবতেন। তারপর শুরু করতেন লেখা।

তখন তাঁর লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হত।

অরবিন্দ খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন না বটে, কিন্তু লিখতে আরম্ভ করে লেখনীকে বিশ্রাম দিতেন না। সে সময়ে তাঁকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হতেন। অথচ সে বিরক্তি অন্যে কেউ বুঝতে পারত না।

অরবিন্দের ওপর কোন রিপুই কোনদিন আধিপত্য করতে পারে নি। অনেক কালের সাধনা ছাড়া মানুষ কখনো এমন ভাবে আত্মজয় করতে পারে না।

অকুণ্ঠ প্রশংসা করে ঘর থেকে উঠে গেলেন রমেশচন্দ্র। অরবিন্দ লক্ষ্য করলেন—যে রকম উজ্জ্বল ও হাসিমাখা মুখ নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, যাবার সময় অনেক তার পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের এত উল্লসিত প্রশংসাতেও অরবিন্দ উল্লসিত হয়ে ওঠেননি।

সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, নিন্দা-প্রশংসায় অরবিন্দ চিরদিন সমান নির্বিকার।

কি বিচিত্র যোগাযোগ! এ যেন শ্রীচৈতন্য ও রঘুনাথের গঙ্গা-বিহারের উপাখ্যান।

রঘুনাথ লিখেছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের টীকা। শ্রীচৈতন্যও লিখেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের টীকা শোনার পর রঘুনাথের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেছিলেন—"তোমার এ টীকা আমার লেখা টীকা থেকেও অনেক সুন্দর—অনেক প্রাঞ্জল। তোমার এ গ্রন্থ প্রচারিত হলে আমার লেখা গ্রন্থ আর কেউ পড়বে না।"

তাতে বন্ধুত্বের হৃদয়ে পড়েছিল আঘাত। শ্রীচৈতন্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নিজের পাণ্ডুলিপি গঙ্গার জলে।

এ যেন সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। এক প্রতিভার কাছে আর এক প্রতিভার পরাজয়।

ভারতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রমেশচন্দ্র হার মানলেন অরবিন্দের কাছে। কারণ অরবিন্দের জন্য অপেক্ষা করছে ভাবীকালের মহাকীর্তির জয়রথ।

অরবিন্দ ইংরেজী কবিতা লিখতেন নানা ছন্দে। ভাষার

উপর অসাধারণ অধিকার না থাকলে ভাষাকে অমন ছন্দের দোলায় দোলাতে কেউ পারেন না।

অথচ তাঁর ইংরেজী কবিতাগুলি সরল ও মধুর; বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী। শব্দচয়নের ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসামান্য। শব্দের অপপ্রয়োগ কখনো তিনি করতেন না।

যা লিখতেন, অতি সহজ গতিতেই তা কলমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত। কাটাকাটি প্রায়ই তিনি করতেন না।

লেখবার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল তাঁর। চুপচাপ সিগারেট টানতে টানতে কিছুক্ষণ ভাবতেন। তারপর শুরু করতেন লেখা।

তখন তাঁর লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হত।

অরবিন্দ খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন না বটে, কিন্তু লিখতে আরম্ভ করে লেখনীকে বিশ্রাম দিতেন না। সে সময়ে তাঁকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হতেন। অথচ সে বিরক্তি অন্যে কেউ বুঝতে পারত না।

অরবিন্দের ওপর কোন রিপুই কোনদিন আধিপত্য করতে পারে নি। অনেক কালের সাধনা ছাড়া মানুষ কখনো এমন ভাবে আত্মজয় করতে পারে না।

আত্মপরীক্ষা

অরবিন্দ বরোদায় বেতন পেতেন প্রায় এক হাজার টাকা। তখনকার দিনে এই টাকার মূল্য নেহাত কম ছিল না।

তবু মাসের শেষে একটি পয়সাও অরবিন্দের হাতে থাকত না। কখনও এমন দিন গিয়েছে যে, তাঁকে কোন বন্ধুর কাছে ধার করতে হয়েছে।

কেউ তাঁর কাছে টাকা চাইলে তিনি না করতে পারতেন না। কোন প্রার্থী তাঁর কাছে বিমুখ হয় নি। বরং প্রার্থীর প্রয়োজনকেই তাঁর নিজের প্রয়োজনের চাইতে তিনি বড় মনে করেছেন।

একদিন অরবিন্দ তাঁর মায়ের কাছে অথবা বোনের কাছে টাকা পাঠাবার জন্য মানি-অর্ডারের 'ফরম' পূরণ করছিলেন।

এমন সময় দীনেন্দ্রকুমার সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর ইচ্ছা বাড়িতে কিছু টাকা পাঠাবেন। ক'দিন ধরেই তিনি টাকা পাঠাবার কথা ভাবছেন।

দীনেন্দ্রকুমারকে দেখে অরবিন্দ বললেন—একি দীনেন্দ্রবাবু, আপনি হঠাৎ এ সময়ে কেন ?

দীনেন্দ্রকুমার আসল উদ্দেশ্য গোপন করে বললেন—না এমনি এসেছি।

অরবিন্দের কেমন যেন সন্দেহ হল। তিনি দীনেন্দ্রকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কিছু যেন বলবেন মনে হচ্ছে ?

দীনেন্দ্রকুমার তখন সংকুচিত ভাবেই বললেন—আপনি ঠিকই

ধরেছেন। যে কথা বলবো মনে করেছিলাম তা বলতে সাহস হচ্ছে না।

অরবিন্দ বললেন—কেন? সাহস না হবার কি কারণ আছে?

দীনেন্দ্রকুমার বললেন—বাড়িতে আমিও টাকা পাঠাব ভাবছি ক'দিন থেকেই। কিন্তু আপনার কাছে এখন টাকা আছে কি না আছে তা ঠিক জানি না বলেই ইতস্ততঃ করছি।

—আহা, এতে ইতস্ততঃ করবার কি আছে? টাকা পাঠাতে হবে, পাঠাবেন না?

এই বলে অরবিন্দ হাসতে হাসতে তখনই বাক্সের ভেতর থেকে তাঁর হাতব্যাগটি বের করলেন। ব্যাগে যে সামান্য কিছু টাকা ছিল তা ঝেড়েঝুড়ে দীনেন্দ্রকুমারকে দিয়ে দিলেন। বললেন—আর টাকা নেই, এ ক'টা টাকা আপনিই পাঠিয়ে দিন।

দীনেন্দ্রকুমার অবাক্ হয়ে বললেন—সে কি কথা! আপনি টাকা পাঠাবেন বলে মানি-অর্ডার ফরম লিখতে আরম্ভ করেছেন যে। আপনিই তা পাঠিয়ে দিন, আমি না হয় কয়েকদিন পরে পাঠাব।

অরবিন্দ মাথা নেড়ে বললেন—তা হয় না। আপনার দরকারই বেশী। আমি পরে পাঠালেও ক্ষতি নেই।

মানি-অর্ডারের ফরম আর লিখলেন না অরবিন্দ। তখনই লেখা বন্ধ করে সেটি তুলে রেখে দিলেন।

বরোদায় থাকতেই অরবিন্দের বিয়ে হয়। তাঁর পত্নীর নাম ছিল মৃণালিনী দেবী। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা।

ভূপালচন্দ্র বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের একজন উর্ধ্বতন রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁর কন্যার জন্য সুপাত্রের অভাব ছিল না। একটু চেষ্টা করলেই উচ্চপদস্থ কোন যুবক রাজকর্মচারীর হাতেই কন্যাকে তুলে দিতে পারতেন।

কিন্তু তিনি তা করেন নি।

ভূপালচন্দ্র ছিলেন অমায়িক, উদারহৃদয় ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। নিজের উদার দৃষ্টি নিয়েই তিনি অরবিন্দকে বিচার করেছিলেন। অরবিন্দের ভেতর এমন এক মানুষকে দেখেছিলেন যার জন্য তাঁর হাতে মেয়েকে তুলে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নি ভূপালচন্দ্র।

কিন্তু একদিক দিয়ে হয়তো ভূপালচন্দ্র ভুল করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন অরবিন্দের পাণ্ডিত্য—অরবিন্দের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবন। কিন্তু তাঁর সাংসারিক উদাসীনতা এবং মনের যোগমগ্ন ভাবটি লক্ষ্য করেন নি।

তাই বিশ্ববন্দিত স্বামী পেলেও মৃণালিনী ছিলেন স্বামি-বিরহিণী।

পত্নীর সঙ্গে অরবিন্দের বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না, তবে তিনি নিয়মিতভাবে তাঁকে পত্র লিখতেন এবং খরচ পাঠাতেন।

আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি ভাব রাখলে জ্ঞানচর্চার বিশেষ বিঘ্ন ঘটে বলে অরবিন্দ ইচ্ছা করেই আত্মীয়দের সংস্পর্শে বড় বেশী আসতেন না।

বিয়ের পর তাঁর পত্নী ও ভগিনী মাঝে মাঝে বরোদায় গিয়ে থাকতেন। মাতুল বংশের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই অরবিন্দের কিছুটা বেশী সম্পর্ক ছিল।

মায়ের সঙ্গেও অরবিন্দ বেশীদিন বাস করেন নি। কিন্তু মায়ের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। মাকে এবং ভগিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষকে তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাতেন।

বরোদায় অরবিন্দের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা—লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

মহারাষ্ট্রের মহামনস্বী এই জননেতার সঙ্গে অতি আশ্চর্যভাবেই মিলন ঘটে ভাবী যুগের এক বিপ্লবী ও মহাতপস্বীর।

মারাঠী ভাষা বেশ ভালভাবেই জানতেন অরবিন্দ। মারাঠী ছাত্ররা এজন্য তাঁর বিশেষ অনুরক্ত ছিল।

মারাঠা জাতির ভেতর রয়েছে প্রাচীন এক মহান্ ঐতিহ্য।

মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর রক্ত মারাঠা জাতির ধমনীতে এখনও প্রবহমান।

এই জাতি আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক শিবাজীর আদর্শে—শিবাজীর অখণ্ড ভারত গঠন করার মন্ত্রে...

অরবিন্দ মারাঠী ছাত্রদের ভেতর ছড়িয়ে দিতেন এই বাণী। তাদের ভেতর জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার করতে চেষ্টা করতেন তিনি।

লোকমান্য তিলক যখন বরোদায় এলেন তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই দেখা করলেন অরবিন্দের সঙ্গে।

আদর্শে ও ভাবধারায় দুজনেই দুজনের মধ্যে এক নিবিড় যোগ খুঁজে পেলেন।

হল বন্ধুত্ব।

এমন বন্ধুত্ব খুব কম জনের সঙ্গেই হয়ে থাকে।

রাজনীতিক্ষেত্রে উভয়ের সহযোগিতা জাতীয় ইতিহাসে পরবর্তী কালে করেছিল এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা।

এই বন্ধুত্বের সূত্রেই সমগ্র মারাঠা জাতির সঙ্গে অরবিন্দের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবেই মহারাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে প্রাণের যোগাযোগ সৃষ্টি হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন গ্রহণ করে এক বিরাট ভূমিকা।

বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় মারাঠা এবং বাংলা যে পরস্পর গলাগলি করে কাজে নামবার প্রেরণা পেয়েছিল, তার মূলে ছিল অরবিন্দের সঙ্গে মহাত্মা তিলকের বন্ধুত্ব।

অরবিন্দের প্রতি মারাঠা জাতির ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, তাঁরা কয়েকবার ঐ প্রদেশ থেকে তাঁকে ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভার সভাপতি মনোনয়নের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ সম্মত হন নি।

অরবিন্দের যোগসাধনার সূত্রপাত বরোদায় থাকতেই হয়। দীর্ঘকাল বিলেতে কাটিয়ে এলেও অরবিন্দ মনে-প্রাণে ভারতীয়ই ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে বাস করে সেই শিক্ষার আবহাওয়ার মানুষ হলেও পাশ্চাত্ত্য মোহ তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের লেখা ও বক্তৃতার মারফত তিনি ধর্ম ও দর্শনের আস্বাদন লাভ করেন। তার আগে, তরুণ বয়সে দর্শনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না—সেদিকে তাঁর কোন আকাজ্ক্ষাও দেখা যায় নি।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যেন তাঁর সামনে এক নতুন জগৎ খুলে দিলেন। ভারতীয় সাধনা এবং ভারতীয় সনাতন ধর্মের প্রতি তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। এমনকি, মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে হল তাও অরবিন্দের অভিপ্রায় অনুযায়ী সনাতন ধর্মের বিধি অনুসরণ করেই সম্পন্ন হল।

সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ থেকেই তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার আকাজ্ক্ষা জেগে উঠল।

কিন্তু ঈশ্বরকে জানতে হলে যোগ-অভ্যাস করা দরকার। যোগ-অভ্যাস ছাড়া ইশ্বরকে জানা কোনরকমেই সম্ভব নয়। তাই অরবিন্দ যোগানুশীলনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

অরবিন্দ যার তার সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন না। এজন্যই বরোদার জনসাধারণ তাঁকে নিয়ে হইচই করবার সুযোগ

পায় নি। অথচ সেখানে সকলেই তাঁকে জানত এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা করত।

বরোদায় যে দুচারজনের সঙ্গে অরবিন্দের বন্ধুত্ব হয়েছিল, তেমন বন্ধুত্বের নজির সহজে কোথাও মেলে না।

সবকিছু শেখার ভেতরেই ছিল অরবিন্দের গভীর একাগ্রতা। এজন্যই তাঁর শিক্ষা সফল হতো। খুব যত্ন নিয়ে তিনি বাংলা ভাষার মত মারাঠী ভাষা শিখেছিলেন। মারাঠী ভাষার অপভ্রংশ 'মোরি' ভাষা শিক্ষায় তাঁর কত না আগ্রহ ছিল!

বাল্যকালে বাংলা ভাষায় তাঁর কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও পরম একাগ্রতার সঙ্গে তিনি সেই ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তাই পরবর্তী কালে তিনি 'ধর্ম' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর দার্শনিক ও রাজনীতিক বাংলা লেখাগুলি শুধু গাম্ভীর্যপূর্ণ নয়, তাতে মধুর হাস্যরসেরও খোরাক ছিল।

অরবিন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের একজন অনুরাগী পাঠক। দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দের জন্য কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথের বই এবং অন্যান্য অনেক বাংলা বই নিয়মিতভাবে আনাতেন।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন কবিতা পড়ে অরবিন্দও ডুবে যেতেন এক আধ্যাত্মিক জগতে।

অরবিন্দ বলতেন—দীনেনবাবু, আপনি তো আমাকে বাংলা অনেক শেখালেন। আমি আপনাকে কি শেখাই বলুন তো?

দীনেন্দ্রকুমার হাসতে হাসতে জবাব দিতেন—আমাকে আপনি কি শেখাবেন? আত্মবাদ?

অরবিন্দ বলতেন—না, আপনি আমাকে ভাষা শিখিয়েছেন, আমিও আপনাকে ভাষা শেখাবো। আপনি শিখিয়েছেন বাংলা, আমি শেখাবো ফরাসী ও জার্মান।

দীনেন্দ্রকুমার বলতেন—আচ্ছা বেশ, শিখবো আমি।
কিন্তু ঐপর্যন্তই। শেখা আর হয় নি।

সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে বিষ্ণুভাস্কর লেলে নামে একজন যোগী ছিলেন। অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন তাঁকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে এলেন যোগ সম্বন্ধে উপদেশ নেবার জন্য।

সেই সূত্রে অরবিন্দের পরিচয় হল লেলের সঙ্গে। নানা বিষয়ে পরামর্শ হল। তাতে যোগের প্রতি তাঁর আগ্রহ খুবই বেড়ে গেল। তিনি যেন নতুন এক পথের সন্ধান পেলেন।

কিন্তু কয়েক বছর আগে এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ও ইচ্ছা ছিল অন্য রকম।

অরবিন্দ ইংলণ্ডে থাকতে ক্যাম্ব্রিজে তাঁর এক বন্ধু জুটেছিল। তাঁর নাম কে. জি. দেশপাণ্ডে। দেশপাণ্ডে ছিলেন একজন সাধক ও যোগী। তিনি অরবিন্দকে যোগসাধনার অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অরবিন্দের তখন এসব বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল না।

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এই মনোভাবটাই ছিল অরবিন্দের মনে তখন প্রবল। তাই দেশপাণ্ডে যখন অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—কি মিঃ ঘোষ, যোগ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী? তখন অরবিন্দ জবাব দিলেন—যোগ করতে হলে সংসার ছেড়ে চলে যেতে হয়। সে তো সংসার থেকে অবসর গ্রহণের নামান্তর মাত্র।

সেই অরবিন্দই পরে মহাযোগী লেলের কাছে যোগসাধনায় দীক্ষা নিলেন এবং ধীরে ধীরে কিছু যোগাভ্যাসও করতে লাগলেন।

বাংলার মাটিতে

বাংলার মাটি হাতছানি দিয়ে ডাকে অরবিন্দকে।

বরোদা তাঁর কর্মস্থল হলেও প্রাণকেন্দ্র তাঁর বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে তাঁর মন। প্রতি ধূলিকণার স্পর্শ বুঝি তাঁর মনে এসে লাগে। বাতাসের প্রতিটি শিহরন বুঝি তাঁর মনে এসে দোলা দেয়।

১৯০৫ সাল।

বাংলায় শুরু হল এক নতুন যুগের অধ্যায়।

বাংলার আকাশ বাতাস বঙ্গভঙ্গের করুণ মর্মবেদনায় ভরে উঠল।

আসমুদ্রহিমাচল সেই ব্যথাতুর হৃদয়ের হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

ভারতের সর্বত্র অনুভূত হল ঘুমন্ত জাতির জাগরণের সাড়া।

লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট।

বাঙালী জাতি তখন ভারতের সমগ্র জাতির পথ-প্রদর্শক—নেতা।

বাঙালীর মেধা, প্রতিভা ও বুদ্ধি সমগ্র ভারতকে দেয় প্রেরণা—দেয় কর্মের পথনির্দেশ।

সুচতুর ইংরেজ জাতির চোখে বাঙালীর এই প্রাধান্য অসহ্য—বাংলার অগ্রগতি ক্ষমার অযোগ্য।

ইংরেজরা স্পষ্টই বুঝতে পারল, ভারতের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে অখণ্ড এক চেতনার সঞ্চার করতে পারবে এই বাঙালী। তাই খর্ব করতে হবে বাঙালীর শক্তি—বাঙালীর উদ্যম।

লর্ড কার্জন স্থির করলেন—বাংলাদেশকে দুভাগ করলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে—অখণ্ড বাংলার শক্তি হবে দ্বিখণ্ডিত।

লর্ড কার্জনের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে বাংলার জননেতারা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল প্রভৃতি নেতারা অকুণ্ঠ ভাষায় করলেন প্রতিবাদ।

বজ্রকণ্ঠে বললেন—মেনে নিও না বাঙালী, এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত। ভারতের জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করার এই চক্রান্তকে তোমরা ব্যর্থ কর!

অনেক আবেদন নিবেদন করা হল সরকারের কাছে। কিন্তু কোন ফল হল না। সরকার তাঁদের অনুসৃত নীতি থেকে সরে যেতে স্বীকৃত হলেন না।

বাঙালীর সমস্ত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে গেল। কার্জনী নীতিই হল বহাল।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশকে ভাগ করা হল দু ভাগে। ঢাকা শহরে স্থাপন করা হল পূর্ববঙ্গের রাজধানী।

ব্রিটিশের এই ভেদনীতি ব্যর্থ করবার জন্য সমগ্র বাঙালী জাতির ভেতর একটা সাড়া পড়ে গেল। সারা বাংলা জুড়ে শুরু হল এক অপূর্ব আলোড়ন।

সুরেন্দ্রনাথ সেনাপতিরূপে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন।

এগিয়ে এলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ… করলেন 'রাখীবন্ধন'

উৎসবের সূচনা.......বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে লাগল মিলনের গান—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।

....

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

বাঙালীর প্রাণমনকে একসাথে বেঁধে দেবার জন্য ঘরে ঘরে শুরু হল রাখীবন্ধনের ঘটা....হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ভুলে মিলিত হল একসঙ্গে.......

দুঃখের মাঝেও বাঙালীর সে এক মহা আনন্দের দিন।

বরোদায় অরবিন্দের মনেও বাংলার নতুন আন্দোলনের ঢেউ এসে দোলা লাগিয়ে দিল।

বরোদায় বসে ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রবর্তন করবার সুযোগ অনেক দিন ধরেই তিনি খুঁজে আসছিলেন। দেশের জন্য কি করা যায় এই প্রশ্ন তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল।

সহসা মাতৃভূমি থেকে তিনি যেন শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলেন।

চঞ্চল হয়ে উঠল অরবিন্দের মন।

প্রবাসে ধ্যাননিমগ্ন থাকতে তিনি আর পারলেন না। বরোদার রাজসম্মান, উচ্চ বেতন ও পদগৌরব উপেক্ষা করে তিনি দুঃখিনী বঙ্গজননীর ক্রোড়ে ছুটে এলেন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, অরবিন্দ কি এই সর্বপ্রথম দেশ-মাতৃকার আহ্বান অনুভব করলেন?

তার উত্তর—না।

অরবিন্দ বরোদায় থাকবার সময় যেসব সাহিত্য রচনা করেছেন তা পাঠ করে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় তাঁর মন পরাধীন জন্মভূমির চিন্তায় সর্বদাই আচ্ছন্ন ছিল। সেই সময়ে রচিত তাঁর অনেক কবিতায় তিনি স্বদেশ ও স্বদেশের পূজারীদের বন্দনা করেছেন।

"Perseus the Deliverer" বা মুক্তিদাতা পারসিউস নামক কবিতায় অরবিন্দ দৈবশক্তি ও আসুরশক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, তাতে নির্মমভাবে ফুটে উঠেছে বিজিত উৎপীড়িত জাতির মর্মবেদনা।

এভাবে কবিতায় কেবল বন্দনা বা রূপক লিখেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, বরোদায় থাকতেই তিনি রীতিমত রাজনীতিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

অরবিন্দ রাজনীতিক প্রবন্ধ লিখতে বিশেষভাবে উৎসাহ পান তাঁর পুরানো বন্ধু কে. জি. দেশপাণ্ডের কাছ থেকে। এ নিয়ে দেশপাণ্ডের সঙ্গে অরবিন্দের আলাপ আলোচনাও কম হত না।

বরোদায় অরবিন্দের আরও একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটেছিলেন। তাঁর নাম লেফটেনাণ্ট মাধবরাও যাদব। অরবিন্দ বেশির ভাগ সময় তাঁর বাড়িতেই বাস করতেন।

রাজনীতি বিষয়ে মাধবরাওয়ের জ্ঞান ছিল স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। অবশ্য অরবিন্দের সঙ্গে সব বিষয়ে তাঁর বনিবনাও হত না। তবু এই দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর রাত পর্যন্ত নানা আলোচনায় মেতে থাকতেন।

অরবিন্দ যে পরবর্তী জীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন তাতে এই সব বন্ধুদের প্রভাবও মুখ্যতঃ না হলেও গৌণতঃ ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

বোম্বাই থেকে তখন একটি পত্রিকা বের হত, তার নাম 'ইন্দুপ্রকাশ'। তখনকার দিনে ইন্দুপ্রকাশ ছিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত কাগজ। তার রাজনৈতিক মতামতের মূল্য ছিল যথেষ্ট।

বন্ধু দেশপাণ্ডে অরবিন্দকে অনুরোধ করলেন সেই কাগজে লেখবার জন্য।

অরবিন্দ প্রথমে রাজী হন নি। পরে অবশ্য রাজী হলেন। কারণ দেশপাণ্ডে ছিলেন সেই কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম।

অরবিন্দ অবশ্য রাজী হলেন একটি শর্তে! প্রবন্ধ তিনি লিখতে পারেন—কিন্তু নিজের নামে লিখবেন না—লিখবেন ছদ্মনামে।

দেশপাণ্ডে তাতেই রাজী হলেন।

ছদ্মনামেই অরবিন্দ 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে লিখতে লাগলেন।

অদ্ভুত তাঁর ভাষা, অদ্ভুত তাঁর ভঙ্গী আর অদ্ভুত তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরই চারদিকে আলোড়ন শুরু হল। পাঠকদের ভেতর জেগে উঠল কৌতূহল।

কে এই ছদ্মনামধারী লেখক? কে তিনি?

লেখকের পরিচয় জানবার জন্য চারদিক থেকে আসতে লাগল নানা প্রশ্ন ও নানা চিঠি।

অরবিন্দ আত্মপ্রকাশ করতে রাজী হলেন না। ছদ্মনামের আড়ালেই রয়ে গেলেন।

'ইন্দুপ্রকাশ'-এ যেসব লেখা প্রকাশিত হত সেগুলির ছিল একটি বিশেষ শিরনামা—"New lamps for old" অর্থাৎ পুরাতনের বিনিময়ে নূতন প্রদীপ।

এই প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ এত বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে লাগল যে মহামতি গোবিন্দ রাণাডে পর্যন্ত ছুটে এলেন 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর কার্যালয়ে।

'ইন্দুপ্রকাশ'-এর সত্বাধিকারীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—কে লিখছে এমন অগ্নিময়ী রচনা? বন্ধ করুন, শিগ্‌গির বন্ধ করে দিন এই সব লেখা। এভাবে আর কিছুদিন চললে আপনাদের রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে।

রাণাডের কথায় সত্বাধিকারীরা সতর্ক হলেন। তাঁরা অরবিন্দকে অনুরোধ করলেন—দয়া করে একটু নরম ভাষায় লিখুন, নইলে বিষম বিপদে পড়তে হবে।

অরবিন্দ প্রশ্ন করে পাঠালেন—বিপদ কার? আমার না আপনাদের?

সত্বাধিকারীরা জবাব দিলেন—বিপদ দু পক্ষেরই। ব্রিটিশ সরকার সঙ্গিন উঁচু করেই আছেন।

অরবিন্দ ভয় করেন না নিজের বিপদকে। কিন্তু কাগজের কর্তৃপক্ষের বিপদ, তা তিনি এড়াবেন কেমন করে?

তাই অরবিন্দ স্থির করলেন, লেখা বন্ধ করে দেবেন।

কিন্তু বন্ধু দেশপাণ্ডে এসে বললেন—ভাই, তোমাকে লিখতেই হবে।

অরবিন্দ বললেন—প্রাণহীন লেখা লিখে কি লাভ হবে বলতে পার?

দেশপাণ্ডে বললেন—যা হয় তাই হবে। তবু তো কাগজটা বেঁচে থাকবে। এখন হঠাৎ তোমার ঐ লেখা বন্ধ করলে কাগজের প্রচার সংখ্যা কমে যাবে অনেক।

অরবিন্দ বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করলেন। সুর নরম করেই লিখতে লাগলেন প্রবন্ধ।

কিন্তু লেখায় তেমন উৎসাহ আর পেলেন না। কিছুকাল পরেই লেখা বন্ধ হয়ে গেল।

লেখা বন্ধ হলেও অরবিন্দের প্রাণের উৎসধারা রুদ্ধ হল না। আগ্নেয়গিরির মত তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত অগ্নিধারা সঞ্চারিত হতে লাগল।

১৯০৪ সালে অরবিন্দ কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করলেন। তাতে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের ভেতর তিনি লক্ষ্য করলেন তাতে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হল। ভারতবাসীর মনের ভেতর যে ধীরে ধীরে দেশপ্রেমের জোয়ার উথলে উঠছে তা বুঝতে পেরে অরবিন্দ খুশী হলেন।

তাঁর মনের প্রেরণাও যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

১৯০৫ সালে কাশীতে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। তিনি তাতে উপস্থিত হতে না পারলেও অধিবেশনের কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রের বাইরে থেকেও অরবিন্দ বুঝতে পারলেন, কংগ্রেসের পুরনো গতানুগতিক পন্থা যেন ক্রমশঃই নতুনের বন্যার এক নতুন খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী কংগ্রেসকর্মীদের ভেতরেও ক্রমশঃ সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন দলের।

আলাদা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, ভিন্ন তাঁদের মতবাদ।

কেবল আবেদন নিবেদনের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করা কিংবা কালি-কলম খরচ করে দেশসেবার ভূমিকায় অংশ নেওয়া যেন অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ অভিনয় করার ইচ্ছা তাঁদের নেই।

এই মতাবলম্বী লোকদের নাম হল—Extremist বা গরমপন্থী।

তাঁরা কংগ্রেসের নানা কাজের সমালোচনা করতে লাগলেন।

১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেসকে সতর্ক করে দিতেও তাঁরা ছাড়লেন না।

১৯০৬ সালের কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ঘটল এর চরম পরিণতি।

নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে মতান্তর ক্রমশঃই বেড়ে উঠল। প্রতিবাদস্বরূপ গরমপন্থীরা কংগ্রেসমণ্ডপ ত্যাগ করে বাইরে চলে গেলেন।

ভাবুক ও চিন্তাশীল অরবিন্দ লক্ষ্য করলেন, দেশের জাতীয় ধমনীতে যেন জীবনসঞ্চার হচ্ছে। তিনি নিজেও দেশমাতৃকার আহ্বান মর্মে মর্মে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে লাগলেন।

তখন অরবিন্দের চাকুরি জীবনের পদমর্যাদা বেড়েছে। অধ্যাপক থেকে হয়েছেন উপাধ্যক্ষ। মাইনেও বাড়ছে ক্রমশঃ।

তবু এই পদমর্যাদা ও অর্থলোভ তাঁকে বেঁধে রাখতে পারল না।

তখনই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বাংলায় ছুটে এলেন অরবিন্দ। প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে আবার পা দিলেন।

বাংলার লোক এর আগে অরবিন্দকে জানত না, চিনত না। এবার তারা বুঝতে পারল, অরবিন্দ শুধু জ্ঞানের সাধক নন, তিনি ভারতের জাতীয় যজ্ঞের প্রকৃত পুরোহিত, ভারতবাসীর সত্যিকার মন্ত্রদাতা গুরু।

মহামতি গোখেল একদিন বলেছিলেন—"What Bengal thinks today India thinks tomorrow." কথাটা খুবই সত্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গে একদিন সারা ভারত দোলায়িত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই তরঙ্গ প্রথম দুলে উঠেছিল বাংলাদেশে, একথা বললে ভুল হবে না। জাতীয় জীবনগঠনের জন্য তখন বাংলাদেশের দিকে দিকে নানা আয়োজন চলছে। বাংলাদেশের নানা জায়গায় চলছে সভাসমিতির অনুষ্ঠান।

ধনী গরিব মধ্যবিত্ত সকলেই মেতে উঠেছে কী এক উন্মাদনায়।

কলকাতার টাউন হলে বিরাট এক সভা হল। তার সভাপতি হলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

বিরাট সভা—বিশাল কক্ষে তিলধারণের স্থান পর্যন্ত নেই।

বক্তৃতা দিলেন বাংলার অনেক জনবরেণ্য নেতা। তাঁদের কণ্ঠে বাংলা বিচ্ছেদের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর……নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ কর—সেটাই হবে বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করবার একমাত্র অস্ত্র।

শুধু বাংলায় নয়, ভারতের দিকে দিকে সেই বাণী ঘোষিত হতে লাগল।

বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মারফত ঘন ঘন প্রচারিত হতে লাগল সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পালের বাণী—গ্রহণ কর সবে অখণ্ড বাংলা গঠনের সংকল্প····গ্রহণ কর বিদেশী-দ্রব্য-বর্জন মন্ত্র।

সে আহ্বানে চারদিক থেকে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে সাড়া এল। সমগ্র দেশ গ্রহণ করল বর্জন-নীতি।

কেউ আর বিদেশী জিনিস ব্যবহার করবে না, বিলাতী জিনিস ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করবে।

বাংলার এই আন্দোলনের ঢেউ দেখতে দেখতে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতকে কাঁপিয়ে তুলল।

এই আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূলসূত্র স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হল।

বাংলাদেশকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে বাঙালীর শক্তিকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন যে চক্রান্ত করলেন, তার বিপরীত ফল ফলল।

সুষুপ্তি-নিমগ্ন একটা বিরাট জাতি তাদের শত শত বছরের মোহনিদ্রা ভেঙে জেগে উঠে এক মহা একতার বন্ধনে আবদ্ধ হল।

সবার কণ্ঠে একসঙ্গে ধ্বনিত হল—বন্দে মাতরম্। হিমালয় থেকে কুমারিকা এবং বেলুচিস্তান থেকে ব্রহ্মদেশের অরণ্যে প্রান্তরে, নগরে পল্লীতে, আকাশে বাতাসে ভীম ভৈরব গর্জনে ধ্বনিত হতে লাগল বাঙালী ঋষির সেই মহামন্ত্র—বন্দে মাতরম্।

তখনকার দিনের ঘটনা লক্ষ্য করে অরবিন্দ অভিভূত হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন—"মন্ত্র দেওয়া হল, আর মন্ত্রপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একদিনের মধ্যেই একটা সমগ্র জাতি স্বদেশপ্রেমের পুণ্যধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল।

মা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। যে জাতি একবার সেই স্বপ্নমূর্তি দেখেছে, মাতৃমন্দির নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত, তাঁর বেদীমূলে বলিদান না হওয়া পর্যন্ত কি সে জাতির আর কোন বিশ্রাম, শান্তি বা নিদ্রা থাকতে পারে ?

বিরাট এক জাতি, যে একবার সেই স্বপ্ন দেখেছে, সে কি আর তার বিজেতার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়ে মস্তক অবনত করতে পারে ?"

স্বদেশী আন্দোলন দিনের পর দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল।

বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনের ফলে দেশে কাপড়ের কল এবং অন্যান্য অনেক জিনিস তৈরির কারখানা গড়ে উঠতে লাগল।

মৃতপ্রায় শিল্প আবার যেন জেগে উঠল কোন দৈবশক্তির প্রভাবে।

প্রতিবছর দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা বিদেশে যেত, তার

পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। বহির্মুখী বাঙালী জাতি যেন ফিরে পেল চেতনা। আবার তারা ঘরের দিকে মুখ ফেরাল।

এর ফলে স্বদেশী শিল্পের যতটা উন্নতি না হোক, বিলাতী ব্যবসায়-বাণিজ্যের ভীষণ ক্ষতি হল। তাতে বিদেশী বণিক ও শাসকগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন ভারতবাসীদের ওপর।

বর্জন-নীতির উন্মাদনায় মানুষ চঞ্চল, বঙ্গচ্ছেদের বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ। তার ফলে মানুষের মন হয়ে উঠল উদ্দাম। স্থানে স্থানে উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের আকারে তা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

দোকান থেকে উন্মত্ত জনতা বের করে নিয়ে আসতে লাগল বিলাতী কাপড়—পথের ওপর স্তূপাকার করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

বিলাতী লবণ ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল জলে।

ব্রিটিশ সরকার আর চুপ করে বসে রইলেন না। বিক্ষোভ দমনের জন্য দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

অমানুষিক অত্যাচার চলতে লাগল আন্দোলনকারীদের ওপর। বাংলাদেশের বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হল, তা স্মরণ করলে আজও শিউরে উঠতে হয়।

১৯০৬ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগে কয়েকটি অনাচার ও সরকারী দমননীতির দৃষ্টান্ত অরবিন্দ নিজের চোখে দেখলেন। তাতে তাঁর মন ক্ষোভ ও দুঃখে ভরে গেল।

এতকাল তাঁর মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, কালে হয়তো আবার তিনি চাকরিতে যোগদান করতে পারবেন। এবার সে আশাও মন থেকে মুছে গেল।

সরকারী দমননীতির জঘন্যতম উদাহরণ তিনি নিজের চোখে দেখে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করবার জন্যই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কিন্তু বরোদার চাকরি-সম্পর্কে তখনও কোন ব্যবস্থা তিনি করে আসেন নি। পদত্যাগপত্রও পেশ করেন নি। ভেবেছিলেন যদি সুযোগ আসে তবে আবার চাকরিতে যোগদান করবেন।

কিন্তু সে আশা এখন নির্মূল।

বাংলাদেশের মাটি তাঁকে ডাক দিয়েছে। এখানে থাকা তাঁর একান্ত দরকার।

তাই দেরি না করে অরবিন্দ বরোদায় চলে গেলেন।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পদত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে একেবারে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। এমন একজন সুধীকে হাতছাড়া করতে তাঁদের মন চাইল না।

তখন অরবিন্দ নিলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি। সামান্য কিছুদিন বরোদায় থেকে জুলাই মাসে বাংলাদেশে ফিরে এলেন।

এতদিন বরোদায় বসে অরবিন্দ যে জাতীয় আন্দোলনের পরিকল্পনা করছিলেন, বাংলাদেশের এই আন্দোলনে দেখতে পেলেন তারই রূপ। তাই নিঃসংশয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বাংলায় তখন এক অপূর্ব যুগ।

সেই স্বদেশী আন্দোলনে দেশে সকলের মনে বিশেষ করে তরুণদলের মধ্যে কী সাড়াই না জেগেছিল! সে যুগের অন্যতম বিপ্লবী নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় তার কিছুটা আভাস দিয়েছেন :

"বাংলায় একটা অপূর্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর।

'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ!'

কোন্ দৈবস্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া

উঠিয়াছিল! কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগ-যুগান্তরের আঁধার কোণ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল!

'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'—এই ছত্রটির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদেরই ছবি।

সত্যসত্যই তখন একটা জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য; ইংরেজের তোপ-বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেসিন-গান,—ওসব শুধু মায়ার ছায়া। এ ভোজবাজির রাজ্য, এ তাসের ঘর,—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে।"

শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জনের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রইল না। দেশবাসীর নৈতিক জীবনের ওপরেও তা প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। ছাত্ররা বিদেশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত স্কুল-কলেজও ছেড়ে দিতে লাগল। তারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করল যে, বিদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে হৃদয় থেকে দেশাত্মবোধ দূর হয়ে যায়। মন হয়ে ওঠে সংকীর্ণ ও দাস-ভাবাপন্ন।

দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের জ্ঞান যে বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না,—সেখানে শুধু কেরানীই তৈরী হতে পারে, মানুষ তৈরী কখনো হয় না।

দেশের নেতারা বুঝতে পারলেন, এই সব ছাত্রদের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে বাঙালী যুবকেরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করতে পারে, যাতে তাদের প্রাণে স্বাধীন বৃত্তির প্রতি, জন্মভূমির প্রতি, নিজের জাতির প্রতি অনুরাগ জন্মে, সেই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা দরকার।

গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশে জাতীয় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

নেতারা তারই আয়োজন করতে লাগলেন।

কিন্তু বড় দুরূহ এই কাজ।

অনেক অর্থ অনেক শ্রম দরকার। কে দেবে এত অর্থ, এত শ্রম!

দেশে অনেক ধনী ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁরা যদি এগিয়ে আসেন, যদি দানের হাত প্রসারিত করেন তবেই এ সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

নেতারা আকুল আবেদন জানালেন ধনী ব্যক্তিদের কাছে।

আবেদন ব্যর্থ হল না।

মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী দিলেন এক লক্ষ টাকা। জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও এক লক্ষ টাকা দান করলেন। তারপর রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এলেন এগিয়ে। তিনিও দিলেন এক লক্ষ টাকা।

জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে লাগল।

দেশের গুণী, জ্ঞানী ও মনীষীরা এগিয়ে এলেন। প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর সাধ্যমত সাহায্য করতে লাগলেন।

গঠিত হল একটি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ।

এগিয়ে এলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁরা এই শিক্ষা-পরিষদের কার্য-নির্বাহক নিযুক্ত হলেন।

শিক্ষা-পরিষদের অধীনে বাংলার বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠল জাতীয় বিদ্যালয়। কলকাতায় ও রংপুরে দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হল।

এবার সমস্যা হল কলকাতার জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ কাকে করা হবে? কে নেবেন এমন বিরাট ও মহান্ দায়িত্ব?

কলকাতার জাতীয় কলেজের জন্য চাই একজন যোগ্য অধ্যাপক। অথচ বেতন মাত্র মাসিক দেড়শো টাকা। এর চেয়ে বেশী টাকা দেওয়ার ক্ষমতা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নেই।

তাই যোগ্য লোক বেছে নেওয়ার ব্যাপারে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হল। তখন খবরের কাগজে দেওয়া হল বিজ্ঞাপন।

দরখাস্ত আসতে লাগল।

কিন্তু অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন এত কম টাকায় ভালো লোকের দরখাস্ত কিছুতেই পাওয়া যাবে না। মাত্র দেড়শো টাকায় কোন্ জ্ঞানী গুণী লোক আসতে রাজী হবেন? এমন স্বার্থত্যাগ করবার লোক কে আছে বাংলাদেশে?

কিন্তু কয়েক দিন পরই একটি দরখাস্ত দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন।

দরখাস্ত করেছেন অরবিন্দ ঘোষ।

অরবিন্দ ঘোষের নাম তখনো বাংলাদেশে খুব পরিচিত নয়।

কিন্তু তাঁর অতীত পদমর্যাদার পরিচয় পেয়ে চমকিত হলেন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সমস্ত সদস্যরা।

বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ এক হাজার টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে মাত্র দেড়শো টাকার চাকরি নেবেন?

এ কি সম্ভব!

অরবিন্দ ভুল করেন নি তো?

যাহোক, অবিলম্বেই অরবিন্দের সঙ্গে পরিষদের কর্তৃপক্ষের দেখা হল।

সবাই বুঝতে পারলেন দেশের স্বার্থেই অরবিন্দ নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হয়েছেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় বরোদার জীবন ছেড়ে দুঃখদৈন্যময় বাংলার জীবনই তিনি বেছে নিতে চান। নিজের ধ্যানমগ্ন জীবনকে নিয়োজিত করতে চান বাস্তব কর্মক্ষেত্রে।

এই তার সূচনা।

কলকাতার জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন অরবিন্দ। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কর্তৃপক্ষ খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁকে নিয়োগ করলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এল আর এক বাধা।

বরোদার মহারাজার পত্র নিয়ে একজন দূত এল কলকাতায়। মহারাজ অরবিন্দকে অনুরোধ করেছেন অবিলম্বে বরোদায় ফিরে যাবার জন্য।

তিনি অরবিন্দকে রাজদরবারে এক সম্মানজনক পদ দেবার মনস্থ করেছেন। তাঁর সম্মান-দক্ষিণা ধার্য হয়েছে প্রতিমাসে দেড় হাজার টাকা।

সম্মানজনক পদই বটে! তার ওপর লোভনীয়।

বিষম সমস্যায় পড়ে গেলেন অরবিন্দ।

কি করবেন তিনি! একদিকে মহারাজের আহ্বান—অন্য দিকে বাংলার মাটির ডাক! একদিকে অর্থ ও সম্মান—অন্য দিকে দেশসেবা ও দারিদ্র্য-বরণ।

অরবিন্দ ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে শেষে মনস্থির করলেন।

প্রত্যাখ্যান করলেন মহারাজের আহ্বান। মোটা টাকার চাকরি এবং সম্মানের লোভও পরিত্যাগ করলেন।

ফিরিয়ে দিলেন মহারাজের দূতকে!

পনেরোশো টাকার বদলে মাত্র দেড়শো টাকার চাকরিতেই যোগ দিলেন।

বাংলাদেশের অন্যতম নেতা ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের খ্যাতি

তখন ভারতের মধ্য-গগনে। তাঁর তেজোময়ী বক্তৃতায় মেতে উঠছে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

বিপিনচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' নামে একটি পত্রিকা বের করলেন। নানা প্রবন্ধ লিখে লোকের মনের ভেতর জাগিয়ে তুলতে লাগলেন অনুপ্রেরণা।

'বন্দে মাতরম্'-এর চাহিদা দিনের পর দিনই বাড়তে লাগল। লোক যেন আরও অনেক কিছু চায় এর কাছ থেকে। চায় শক্তি—চায় পথের সন্ধান।

বিপিনচন্দ্র ভাবলেন—এ সময়ে অরবিন্দের মত একজন লোক দরকার। তবেই 'বন্দে মাতরম্' পাঠকদের চাহিদা মেটাতে পারবে—তবেই 'বন্দে মাতরম্' আরও খ্যাতি অর্জন করতে পারবে।

তাই বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অরবিন্দ বিনা দ্বিধায় এসে যোগ দিলেন বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে।

জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের গুরুতর দায়িত্ব অরবিন্দের ওপর থাকলেও 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে যোগাযোগ তিনি রক্ষা করে চললেন।

অরবিন্দের ইচ্ছা ছিল শিক্ষাব্রতের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের কাজ করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

কিছুদিনের মধ্যেই পরিষদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটল।

তখন বিদেশীয় পরিচালিত বহু স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্রদের বিতাড়িত করা হচ্ছিল। সেই সব স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষ যে সব ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে বলে বিবেচনা করতেন, তখনই তাদের বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দিতেন। আর কোনও বিদ্যালয়ে তাদের ভরতি হবার উপায় থাকতো না।

অরবিন্দ এই সব ছাত্রদের জাতীয় বিদ্যালয়ে ভরতি করে নেওয়া দরকার মনে করলেন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ জেদ ধরলেন—তা করা কখনোই সংগত হবে না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য এই যে, সরকারী স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষাদান বিষয়ে যে সকল দোষত্রুটি দেখা যায় জাতীয় শিক্ষাদ্বারা তা দূর করা।

এ বিষয়ে অরবিন্দের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বেশ মতান্তর ঘটল। কর্তৃপক্ষ অরবিন্দের পরামর্শ মেনে নিলেন না, অরবিন্দও কর্তৃপক্ষের যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না।

তা ছাড়া আরও একটি কারণে অরবিন্দের সঙ্গে মতান্তর ঘটল।

জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনায় মহামান্য উদার ব্যক্তিদের সহায়তায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ও জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার শিক্ষা-দীক্ষা চলছিল অনেকটা বিদেশী ধাঁচেই।

অরবিন্দের তা পছন্দ হল না। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের শিক্ষাধারাকে তিনি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে ভারতীয় আদর্শে গড়ে তুলতে চাইলেন।

অরবিন্দ বললেন—যে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হবে ধর্মের ওপর। শিক্ষার্থী শিক্ষা পাবে ধর্মের জন্য, মানবজাতির জন্য, স্বদেশের জন্য, পরের জন্য এবং নিজের জন্যও তাদের বাঁচতে হবে।

কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের যোগ বিষয়ে শিক্ষা-পরিষদের কর্তৃপক্ষ অরবিন্দের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। শিক্ষার আদর্শ এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন—এই সব নানা ধরনের ব্যাপারে অরবিন্দের সঙ্গে তাঁদের মতের মিল হচ্ছিল না।

অরবিন্দ ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন, এভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

চাকরি করার জন্য তিনি কাজ করতে আসেন নি, কাজ করার

জন্যই চাকরি করতে এসেছেন অর্থের ওপর লোভ তাঁর কোন কালেই নেই।

অবিলম্বেই অরবিন্দ অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করলেন।

দেড়শো টাকা বেতনের যে পদ গ্রহণের জন্য তিনি পনেরশো টাকা বেতনের চাকরি অবহেলায় একদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন, অতি দুঃখের সঙ্গেই সে পদও আজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

ছাত্ররা অরবিন্দের পদত্যাগে খুবই মর্মাহত হল। মাত্র এক বছর তিনি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, এর মধ্যেই যেসব বক্তৃতা ছাত্রদের কাছে তিনি দিয়েছেন, তা সত্যই অমূল্য। তা ছাড়া এই অল্পদিনের মধ্যেই অরবিন্দ ছাত্রদের মন জয় করে নিয়েছিলেন।

১৯০৭ সালের ২২শে আগস্ট কলেজের ছাত্ররা অরবিন্দকে বিদায়-অভিনন্দন দেবার আয়োজন করল। সেই অভিনন্দনের উত্তরে অরবিন্দ যা বললেন তার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠল তাঁর মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাণী।

তিনি বললেন—"আশা করেছিলাম, এই প্রতিষ্ঠানে আমরা জাতির একটা শক্তিকেন্দ্র, নবীন ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব,—যাতে ভারত দুঃখনিশার অবসানে নবীন জীবন গঠন করতে পারে—সেই জয়গৌরবমণ্ডিত দিনের জন্য, যখন ভারত জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে।"

ছাত্রদের আহ্বান করে অরবিন্দ বললেন—"আমার কামনা তোমাদের মধ্যে কয়েকজন মহান্ হউক,—কিন্তু তোমাদের নিজেদের জন্য নয়, তোমাদের অহংকার তৃপ্ত করার জন্য নয়। মহান্ হও দেশসেবার জন্য, ভারতকে মহান্ করার জন্য।

"এমন একদিন ছিল, যেদিন সারা জগৎ ভারতের কাছে জ্ঞান ভিক্ষা করত। যাতে ভারত সেরূপ মহান্ হতে পারে এবং পৃথিবীর

সমস্ত জাতিদের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেজন্য তোমাদের মহান্ হতে হবে।

"এমন কি যারা দরিদ্র ও অখ্যাত থাকবে, আমি চাই যে তাদের দারিদ্র্য ও যশোহীনতাও মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত হবে। তোমরা জীবিকা অর্জন করবে যাতে মায়ের জন্য বাঁচতে পার। তোমরা বিদেশে যাবে, যাতে জ্ঞান আহরণ করে মায়ের সেবা করতে পার। শ্রম করবে যাতে মা সমৃদ্ধিশালী হন, ক্লেশ স্বীকার করবে যাতে তিনি তৃপ্ত হন। যদি তোমাদের আমার প্রতি সহানুভূতি থাকে, আমি তা ব্যক্তিগতভাবে দেখতে চাই না—আমি মনে করতে চাই, যে আদর্শের জন্য কাজ আমি করছি, এটা তার প্রতি সহানুভূতি।"

জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে বিদায় নিয়ে অরবিন্দ প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। 'বন্দে মাতরম্'-এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়লেন অরবিন্দ।

সঙ্গে যোগ দিলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তাঁর উদ্যম ও কর্মক্ষমতা অরবিন্দের প্রতিভা ও শক্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে 'বন্দে মাতরম্'-কে আরও সমৃদ্ধ করে তুলল।

এতকাল ছিল 'বন্দে মাতরম্' ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা, এখন থেকে হল ইংরেজী দৈনিক।

অরবিন্দ হলেন 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদক।

অববিন্দ তাঁর তেজোদৃপ্ত রচনা ও বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় আদর্শ প্রচারে ব্রতী হলেন।

একদিকে যেমন জাতীয়দলে শক্তি সঞ্চার করে তিনি মধ্যপন্থী-দল কর্তৃক সৃষ্ট রাজনীতিক কুহেলিকা বিদূরিত করলেন, অন্যদিকে 'বন্দে মাতরম্' সংবাদপত্রের স্তম্ভে দিনের পর দিন জাতীয় জাগরণের তূর্যধ্বনি করতে লাগলেন।

যিনি ছিলেন নিরালায় শিক্ষাব্রতী—তিনি হলেন জাতীয় যজ্ঞের পুরোহিত।

একদিকে মধ্যপন্থীদলের সঙ্গে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল, অন্যদিকে তাঁর শক্তির প্রভাব দেখে তখনকার দিনের রাজপুরুষরা প্রমাদ গণলেন।

অচিরেই তাঁর যশঃসূর্যকে রাজরোষরূপী রাহু গ্রাস করবার জন্য মুখব্যাদান করল।

অরবিন্দের জীবনে ঘনিয়ে এল এক অগ্নিপরীক্ষা।

সে-যুগের কংগ্রেসী নেতারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন আর কোন রাজনীতিক আদর্শ কল্পনা করতে পারতেন না। তাঁদের সে সাহস ছিল না। অবশ্য জাতির পক্ষে পরাধীনতা ক্রমশঃ দুঃসহ হয়ে উঠছিল এবং ধীরে ধীরে স্বরাজের আদর্শ ফুটে উঠছিল। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী এই আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এই 'স্বরাজের' অর্থ নিয়ে বিশ বছর কি যে বাদবিতণ্ডা হয়েছে তা কারুর অজানা নেই। এমন কি কংগ্রেস ১৯২৯ সাল পর্যন্ত—যতক্ষণ না ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জাতীয় দাবি একেবারে উপেক্ষা করলেন—কিছুতেই ঘোষণা করতে রাজী হয় নি যে স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু অরবিন্দ বাংলায় এসেই জাতীয় দলের সামনে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপন করলেন। অথচ ভারতবিখ্যাত নেতারা ভুলেও অরবিন্দের এসব রাজনীতিক কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেন নি। তবে সুভাষচন্দ্র বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে দৃপ্তকণ্ঠে প্রকাশ করেছিলেন যে, জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সর্বপ্রথমে দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

কিন্তু তখনকার দিনে এই আদর্শ নিয়েই শুরু হল কংগ্রেসে

বিরোধ এবং বিরোধের পরিণতি ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে জাতীয় দল ও মধ্যপন্থীদলের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ।

কোন কোন মনীষী এই সংঘর্ষকে জাতীয় কুরুক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে সুরাটে এই রাজনীতিক কুরুক্ষেত্রের ফলেই কংগ্রেসের ভাবী রূপান্তরের সূচনা হয়েছিল। তখন থেকেই ভারতে রাজনীতির গতি একেবারে বদলে গেল। জাতি স্বাধীনতার আদর্শ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করল।

জাতীয় দল গঠনে অরবিন্দের প্রথম কাজ হল একটি নির্ভীক জাতীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' তাঁর সম্পাদনায় তখন ভাল ভাবেই চলছিল।

অরবিন্দ ভাবলেন, এই 'বন্দে মাতরম্' কাগজটিকেই জাতীয় আন্দোলনের একটি প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবেন।

কিন্তু কাগজটি যে অবস্থায় আছে, তার আরও উন্নতি করা দরকার।

টাকা চাই প্রচুর। আর নিজস্ব একটি ছাপাখানাও চাই।

অরবিন্দ এবার ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরুলেন। দেশ-মাতৃকার দুঃখমোচনের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না।

টাকা চাই। প্রচুর টাকা।

এমন হৃদয়বান্ ধনী ব্যক্তি কি নেই যাঁরা জাতির স্বার্থে, এতটুকু নিজের স্বার্থত্যাগ করবেন ?

অরবিন্দকে নিরাশ হতে হল না। এগিয়ে এলেন মহান্ হৃদয় রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক। তিনি টাকা দিলেন।

সেই টাকায় 'বন্দে মাতরম্'-এর নূতন প্রেস করা হল।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতারা সব সময় অরবিন্দের পাশে পাশে ছিলেন। এবার এলেন তরুণ কর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

'বন্দে মাতরম্'-এর রূপও যেন পালটে গেল।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল 'বন্দে মাতরম্'-এর বাণী ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

লেখার ভেতর কী তেজ, কী উদ্দীপনা!

অরবিন্দের লেখা সম্পাদকীয় স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল পাঠকদের প্রধান আকর্ষণ। দিনের পর দিন পাঠকরা সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধ পড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত।

ভারতীয় ইংরেজী সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করলেন অরবিন্দ।

এতদিন নীরবে সাধনা করে তিনি যে তপস্যার তেজ ও শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, এবার বুঝি লেখনীর মুখে তা উৎসারিত হতে লাগল।

সেই তেজ ও শক্তির প্রভাবে জাতি লাভ করল প্রাণে নূতন আশা, হৃদয়ে নূতন বল। মাতৃভূমির সেবায় মানুষ দুঃখকে বরণ করতে শিখল এবং সর্বস্ব ত্যাগ করতেও অনুপ্রেরণা লাভ করল।

এ হয়তো বিধাতার বিচিত্র বিধান। এ জন্যই অরবিন্দ বিলাতে আই. সি. এস. হতে গিয়েও ফিরে এসেছেন, এ জন্যই বরোদার পনেরোশো টাকার চাকরি ও রাজসম্মান হেলায় তুচ্ছ করেছেন।

অরবিন্দের নীতি ও আদর্শ নিয়েই 'বন্দে মাতরম্' পরিচালিত হতে লাগল। কংগ্রেসের আবেদন-নীতির কঠোর সমালোচনা করা হল 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রধান কাজ। আবেদন-নিবেদন করে 'স্বরাজ' কখনো আসতে পারে না—এই সত্যই সে প্রতিপন্ন করতে চাইল।

জাতিকে আত্মনির্ভরতা শেখানোও হল 'বন্দে মাতরম্'-এর আর একটি মুখ্য কাজ।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ছিলেন 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদক। নীতি ও আদর্শ নিয়ে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সঙ্গে শুরু হল বিরোধ। সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু জাতীয় দলের আদর্শের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল না। তিনি তখনকার দিনের অন্যান্য অনেক নেতাদের মতই আবেদন-নিবেদন নীতির সমর্থক ছিলেন।

কিন্তু অরবিন্দের উদ্দেশ্য শুধু রাজনীতিক সংগ্রাম ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন সর্ববিষয়ে ভারতের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলতে। তিনি দেশাত্মবোধের জাগরণেও ভগবৎ প্রেরণা অনুভব করতেন, দেশকে জগন্মাতার মূর্তরূপ বলে মনে করতেন, ভগবৎ সত্তার উপলব্ধিই চরম ব্যক্তিগত আদর্শ বলে প্রচার করতেন। 'বেঙ্গলী' বলত রাজনীতিক্ষেত্রে এসকল জিনিস অবান্তর, কাজেই অরবিন্দের ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি নিয়ে 'বেঙ্গলী' ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। অরবিন্দ 'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন্'-এর ভেতর দিয়ে তার উপযুক্ত জবাব দিতেন।

অরবিন্দ ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ। তিনি জাতির জাগরণে শ্রীভগবানের অমোঘ নির্দেশ দেখেছিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে বলতেন ও লিখতেন যে শ্রীভগবানই আন্দোলনের নেতা। তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করতেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল, আজই হোক বা কালই হোক ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। কাজেই তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা অন্য কোন রাজনীতিক সুবিধাবাদের দ্বারা সাময়িক লাভের আশায় জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ম্লান করতে একেবারেই রাজী ছিলেন না।

অরবিন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, শুধু লেখনী পরিচালনায় ও বাণী প্রচারে কার্যসিদ্ধি হবে না—নেতা হিসাবে তাঁকে জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে হবে, নিজে কাজ করে কর্মীদের প্রেরণা দিতে হবে।

অরবিন্দ স্বয়ং জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

প্রথমে তিনি বাংলার জাতীয় দলকে পরোক্ষে চাল চালবার নীতি ত্যাগ করে আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করলেন—যাতে অকুণ্ঠ ভাবে স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করা যায় এবং দেশের সামনে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপন করা যায়।

তারপর তিনি জাতায় দলকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করলেন।

প্রতি প্রদেশে প্রদেশে গড়ে উঠল জাতীয় দল। তিলক ও অরবিন্দের নেতৃত্বে ক্রমশঃই তাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি হতে লাগল।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা নিখিল ভারতব্যাপী স্বরাজ আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করল।

কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে জাতীয় দলকে অগ্রসর হতে হল। বাংলার জাতীয় দল শক্তিশালী হওয়ার ফলে সুবিধাবাদী ও ধীরপন্থী নেতাদের সঙ্গে শুরু হল সংঘর্ষ। প্রথম সংঘর্ষ হল মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে। মেদিনীপুরে জাতীয় দলের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, কাজেই সেখানে সংঘর্ষ অনিবার্য ভাবে বেঁধে উঠল।

সুরেন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে গোলমাল সামলালেন।

সম্মেলনে মধ্যপন্থীদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। জাতীয় দলের সেখানে সংখ্যাধিক্য থাকলেও তারা আর কোন গোলমাল করল না। অরবিন্দের নেতৃত্বে পৃথক সম্মেলন বসল।

তাতে মূল সম্মেলনের উদ্দেশ্য গেল ব্যর্থ হয়ে।

জাতীয় দল দৃঢ় সংকল্প করল, জাতিকে সর্ববিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল করতে হবে।

মেদিনীপুরে যে সংঘর্ষের শুরু, কয়েকমাস পরে তার পরিণতি দেখা গেল সুরাট কংগ্রেসে। এই কয়েকমাসের মধ্যেই জাতীয় দলের আদর্শ সমগ্র দেশে এরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি করল যে মধ্যপন্থীদল প্রমাদ গণলেন।

সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই বোঝা গেল যে বাংলার ন্যায় মহারাষ্ট্রও সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী। বাংলায় অরবিন্দ ও অন্যান্য নেতৃবর্গ এবং মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক ও তাঁর সহকর্মিগণ জাতীয়তার তূর্যনিনাদে সমগ্র দেশ মুখরিত করে তুললেন।

১৯০৭ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন নাগপুরে হবার কথা ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের কর্তারা বুঝলেন যে নাগপুরের উত্তাপ খুব বেশী—মারাঠাগণ জাতীয় উদ্দীপনায় ভরপুর।

কাজেই নিরাপদ হবার জন্যই তাঁরা সুদূর সুরাট নগরীতে অধিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে তখন মধ্যপন্থী নেতা স্যার ফিরোজ শা মেটার বিরাট আধিপত্য। কাজেই মধ্যপন্থীদল ভাবলেন সুরাটে জাতীয় দল কোনই সুবিধা করতে পারবে না।

কিন্তু দেখা গেল, সময়মত জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ দলবল নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছেন।

আসন্ন ঝড়ের আবহাওয়ার মধ্যেই কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল। তখনকার দিনে প্রাদেশিক সমিতিগুলি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করত না। আগে নেতারা ঠিক করতেন কে সভাপতি হবেন, এবং কংগ্রেসের অধিবেশনেই তিনি মনোনীত হতেন।

মধ্যপন্থীদলের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ স্যার রাসবিহারী

ঘোষের নাম প্রস্তাব করলেন। জাতীয় দলের পক্ষ থেকে লোকমান্য তিলকের নাম প্রস্তাব করা হল।

তার ফলে শুরু হল তুমুল বাদবিতণ্ডা।

তারপর শুরু হল দক্ষযজ্ঞ।

সাধারণতঃ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নতুন সভাপতির নাম প্রস্তাব করতেন।

এক্ষেত্রেও তাই করা হল। সুরেন্দ্রনাথ করলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব। সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবার জন্য তিনি মঞ্চের ওপর উঠলেন।

কিন্তু বারবারই চারদিক থেকে বাধা দেবার চেষ্টা চলতে লাগল।

সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ তিনি যখন যে সভায় গিয়েছেন সে সভাতেই পেয়েছেন প্রচুর সম্মান। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য দর্শকরা উন্মুখ হয়েছে।

মঞ্চে উঠলেই দর্শকরা প্রথমে করেছে হর্ষধ্বনি, তারপর সবাই হয়েছে নীরব নিস্তব্ধ।

কিন্তু একি!

লোকে তাঁর বক্তৃতা শোনা দূরে থাক্, বক্তৃতা করতেই তাঁকে দিচ্ছে না।

তারপর আরও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে লাগল। একদল উত্তেজিত জনতা এগিয়ে আসতে লাগল মঞ্চের দিকে।

চারদিকে জুতো চেয়ার ছোড়াছুড়ি হতে লাগল।

সুরেন্দ্রনাথ কি করবেন তা ভেবেই পাচ্ছিলেন না। কয়েকজন বন্ধু এগিয়ে এসে তাঁকে রক্ষা করলেন। ফিরোজ শা মেটাও মঞ্চে ছিলেন। তাঁকেও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এসে পেছনের তাঁবুতে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে এসে গেল পুলিস। তারা প্যাণ্ডেল থেকে সমস্ত লোকজন সরিয়ে ফেলল। বিক্ষোভকারীদেরও হটিয়ে দিল।

জুতো চেয়ার প্রভৃতি ছোড়াছুড়ির ফলে কয়েকজন নেতা অল্পবিস্তর আহত হলেন।

সেই ভীষণ কাণ্ডের সময়ে চারদিকে 'মার্ মার্' শব্দ উঠছিল আর জুতো, লাঠি প্রভৃতি শিলাবৃষ্টির মত এসে সভামঞ্চের ওপর পড়ছিল। তখনও অরবিন্দ স্থির ধীর নির্বিকার চিত্তে সেখানে বসে ছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নি। উঠে নিরাপদ স্থানে যাবারও চেষ্টা করেন নি।

পুলিস যখন উত্তেজিত লোকদের প্যাণ্ডেল থেকে তাড়িয়ে দিল তখনও তিনি নির্বিকার। যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি।

জাতীয়তাবাদী দলের কয়েকজন লোক এসে বলল—একি, আপনি এখনো বসে আছেন ?

এবার যেন চেতনা হল অরবিন্দের। বললেন—হ্যাঁ, এবার যাব।

তাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে অরবিন্দ বাইরে চলে এলেন।

সুরাট কংগ্রেসের এই ব্যাপার যদিও জাতির পক্ষে একটা কলঙ্ক, তবু এই কলঙ্কই ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সুচনা করল।

সুরাট থেকে ফিরে অরবিন্দ উৎসাহের সঙ্গে জাতীয় দলের প্রচার-কার্য শুরু করলেন। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কয়েক স্থানে জাতীয় দলের আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন।

কলকাতায় এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অরবিন্দ বললেন—ভগবানের ইচ্ছাতেই সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গিয়েছে, আবার যদি কংগ্রেস জোড়া লাগে তবে তা তাঁর ইচ্ছাতেই হবে।

এই সুরাট কংগ্রেসের ব্যাপারেই অরবিন্দ লিখেছিলেন—ভারতকে সবল করবার জন্য, নতুন আদর্শ স্থাপন করবার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। সেই যুদ্ধেই ভারত নতুন আদর্শ লাভ করেছিল আর পেয়েছিল নতুন জীবনের সন্ধান। ঠিক সেরূপ সুরাট কংগ্রেসে যে রাজনীতির কুরুক্ষেত্র ঘটেছিল তারই ফলে আজ ভারতবর্ষের পরিবর্তন ঘটছে, জাতি পূর্ণ-স্বাধীনতার মহান্ আদর্শ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছে।

সাধক ভবিষ্যদ্দর্শী অরবিন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই সফল হয়েছিল।

জাতীয় দলের প্রতি সরকারের মনোভাব এতটুকু প্রসন্ন ছিল না। ইংরেজ সরকার বুঝেছিলেন, জাতীয় দলকে আগে থেকেই দমন না করলে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সেজন্য সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালাতে লাগলেন। ফলে সুরাট কংগ্রেসের পরে জাতীয় দল নানাভাবে বিড়ম্বিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কাজেই কয়েক বছর মধ্যপন্থীদল অপ্রতিহত প্রভাবে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব পরিচালনা করতে লাগলেন।

অবশেষে অরবিন্দের বাণী সত্যে পরিণত হল। ঐ বছর অর্থাৎ ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে মধ্যপন্থী এবং জাতীয় দল একত্র হয়ে যুক্তকংগ্রেসের অধিবেশন করলেন। এরপর ১৯১৭ সালে কলকাতায় মধ্যপন্থীরা কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সেই থেকে কংগ্রেসে জাতীয় দলের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

অরবিন্দ একদিন যে আদর্শ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, সমগ্র জাতি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ণ স্বরাজ—পূর্ণ স্বাধীনতালাভের পথে যাত্রা করল।

রাজরোষের কবলে

সুরাট কংগ্রেস থেকে ফেরার পর থেকেই অরবিন্দ তাঁর দেশ-সেবার আদর্শ ভারতের প্রতি ঘরে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য—তাঁর বাণী প্রত্যেক ভারতবাসীর কানে পৌঁছে দেবার জন্য পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর লেখনীতে ও বক্তৃতায় ঘোষিত হতে লাগল বজ্রনির্ঘোষ বাণী।

নেতৃত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা অরবিন্দের মনে কোনদিন স্থান পায়নি। দেশ ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর দেশের জনসাধারণের মধ্যে সেই বুদ্ধি জাগিয়ে তুলে তাদের ঘুমন্ত হৃদয়ে চেতনা সঞ্চার করে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তিনি নেতার আসনে বসতে চাননি, যশ চাননি। তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল দেশের ও জাতির কল্যাণ। সেই ব্রত উদ্‌যাপনেই অরবিন্দ জীবন উৎসর্গ করলেন।

কিন্তু এদিকে অরবিন্দের ভাগ্যাকাশে অলক্ষ্যে রাজরোষের কৃষ্ণমেঘ ঘনীভূত হতে লাগল।

জাতীয় দলের কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার বেশীদিন বরদাস্ত করতে পারলেন না। এই দলকে নষ্ট করবার জন্য সরকার শুরু করলেন দমননীতি।

দেখতে দেখতে জাতীয় দলের বহু নেতাকে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করতে হল। দেশময় সৃষ্টি হল ভীষণ চাঞ্চল্য।

১৯০৭ সালের ২৭শে জুন অরবিন্দও গ্রেফতার হলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল।

মূল প্রবন্ধটি 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম্'-এ ছাপা হয়েছিল তার ইংরেজী অনুবাদ। 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম 'কাবলী দাওয়াই'।

'যুগান্তর' ছিল সে যুগের একখানি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন কাগজখানির প্রকাশক আর সম্পাদক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

অরবিন্দ রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ামাত্র সারা দেশে ভয়ানক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ছোট বড় চেনা অচেনা সকলের মুখে মুখে অরবিন্দের নাম ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ধন্য অরবিন্দ। বাংলা মায়ের সার্থক সন্তান অরবিন্দ।

সকলের মুখেই প্রশংসা, সকলের মুখেই সহানুভূতি, সকলের মুখেই শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি।

চারদিকে যে অভাবনীয় সাড়া সেদিন দেখা গিয়েছিল—ঐতিহাসিক ঘটনার মত আজও তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও সেদিন আবেগ ও উচ্ছ্বাসময় কণ্ঠে অরবিন্দকে বন্দিত করেছিলেন—

"অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি।"

সরকার অরবিন্দকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও এক বাধার সৃষ্টি হল। সরকার কিছুতেই প্রমাণ করতে পারলেন না যে, অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক। কারণ, তখন সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, শুধু মুদ্রাকরের নাম ছাপা হত।

অবশেষে সরকার এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। 'বন্দে মাতরম্' কাগজের প্রথম উদ্যোক্তা এবং সুপ্রসিদ্ধ নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদেশ করা হল।

তখন অবস্থা হয়ে উঠল খুবই জটিল।

বিপিনচন্দ্র যদি আদালতে দাঁড়িয়ে শুধু বলেন অরবিন্দই কাগজের সম্পাদক, তাহলেই অরবিন্দের শাস্তি হবে।

আর যদি সাক্ষ্য না দেন তাহলে শাস্তি হবে বিপিনচন্দ্রের নিজের।

এখন বিপিনচন্দ্র কি করবেন তা কে জানে?

এ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল।

নির্দিষ্ট দিনে শুরু হল অরবিন্দের বিচার।

আদালত কক্ষ সেদিন লোকে লোকারণ্য।

বিপিনচন্দ্র নির্দিষ্ট সময়েই আদালতে হাজির হলেন। সব লোক অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল তাঁর মুখের কথা শোনবার জন্য।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠলেন বিপিনচন্দ্র।

ঘরে একটি স্থূঁচ পড়লেও বুঝি তার শব্দ শোনা যায়। সব লোক নিস্তব্ধ নীরব।

বিপিনচন্দ্রের মুখে কোন ভাবান্তর নেই। তিনি স্বাভাবিক প্রশান্ত মুখে এসে দাঁড়ালেন কাঠগড়ার ওপর।

সরকার পক্ষের উকিল জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কী জানেন অরবিন্দ ঘোষের সম্পর্কে? তিনিই তো 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক?

নির্ভীক কণ্ঠে বিপিনচন্দ্র বললেন—"I have conscientious objection to take part or swear in these

proceedings." এই মকদ্দমায় কোন অংশ গ্রহণ করতে বা হলফ করতে আমি চাই না, এটা আমার বিবেকবিরুদ্ধ কাজ।

প্রশংসা-ধ্বনিতে আদালত কক্ষ মুখরিত হয়ে উঠল।

রুষ্ট হলেন সরকার পক্ষের উকিল—ক্ষুব্ধ হলেন বিচারক।

আদালতের আদেশ অমান্য করার অপরাধে বিপিনচন্দ্রকে অভিযুক্ত করা হল। ফলে হল তাঁর ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি পেলেন।

কিন্তু মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ বসুর ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ড হল

বিপ্লবের পথে

মুক্তি পেয়ে অরবিন্দ আবার নিজের কাজে মন দিলেন। লেখা ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তাঁর জাতীয়তার আদর্শ ও স্বরাজের আদর্শ চারদিকে প্রচারিত হতে লাগল।

অরবিন্দের আদর্শে দেশ অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ···তরুণ সম্প্রদায় তাঁর একান্ত ভক্ত। তবু তখনও সকলে তাঁর পবিত্র আদর্শ সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন নি।

অরবিন্দ স্বরাজের যে কল্পনা করেছিলেন, তার মধ্যে হিংসাপূর্ণ সশস্ত্র বিপ্লববাদের কোনও ধারণা ছিল না। তাঁর নীতির মূলে ছিল ঈশ্বর-বিশ্বাস। ঈশ্বরের কৃপালাভ হলেই সত্য এবং সংগত দাবির বলেই একদিন ভারতের অধীনতার শৃঙ্খল খসে পড়বে। এই মুক্তি-সংগ্রামের জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের আবশ্যক নেই, হিংসার প্রয়োজন নেই, রক্তপাতের দরকার নেই; প্রয়োজন কেবল নৈতিক বলবৃদ্ধির। তাই অরবিন্দ দেশবাসীর নৈতিক শক্তিলাভের ওপরই জোর দিতে লাগলেন।

কিন্তু মানুষের মনের গতি দুর্বার।

তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের মন আকুল হয়ে উঠল স্বরাজলাভের জন্য।

তারা মুক্তি চায়—পরিবর্তন চায়।

অত্যুগ্র নেশায় মত্ত হয়ে উঠল একদল মানুষ।

বোমা ও রিভলভারের জোরে ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনের উন্মাদ পরিকল্পনা নিয়ে গড়ে উঠতে লাগল বিপ্লবী দল।

অরবিন্দ দিয়েছিলেন যে অগ্নিমন্ত্র, সেই মন্ত্র জ্বলন্ত রূপ নিয়ে করতে লাগল আত্মপ্রকাশ।

অরবিন্দ বুঝলেন এটা হল দীর্ঘকালের ইংরেজ কুশাসনের ফল। মানুষের মনে যে অসন্তোষের অগ্নি ধূমায়িত হয়েছে এটা তারই প্রকাশ। এই অগ্নিকে রোধ করা সহজ নয়।

বাংলায় নানা স্থানে গড়ে উঠল বিপ্লবী দল। সেই দলের নেতা হলেন অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি হলেন বারীন্দ্রের সহকর্মী।

এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার যুবকদল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশে যে ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করলেন তাতে মাতৃপূজার একনিষ্ঠ পূজারী সাধক অরবিন্দকেও বিড়ম্বিত হতে হল।

ঐ সময়ে বিপ্লববাদীরা বাংলার লাটসাহেবের স্পেশাল ট্রেন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হল।

তারপর ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুজন বিপ্লবী যুবক মজঃফরপুরের জেলা জজ মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার জন্য একটি গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করলেন। গাড়িটি কিংসফোর্ডেরই ছিল। কিন্তু তাতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। গাড়ির আরোহী ছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ কেনেডির পত্নী ও তাঁর কন্যা। বোমা নিক্ষেপের ফলে তাঁরাই নিহত হলেন।

কিংসফোর্ডের ওপর বিপ্লবীদের রাগ ছিল অনেক। এর আগে তিনি ছিলেন কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। তখন তাঁর বিচারে কয়েকজন বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয়। একটি যুবকের প্রতি তিনি প্রকাশ্য আদালতে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। সে যুবকের নাম সুশীল সেন।

বিপিন পাল যেদিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন সেদিন ই. বি. হুই

নামে একজন ইংরেজ পুলিস ইন্সপেক্টর ভিড়ের মধ্যে সুশীলকে ঘুষি মারেন। সুশীলের বয়স খুব কম ছিল। তবু সে ছাড়েনি। উলটে সেও পুলিস ইন্সপেক্টরকে ঘুষি মারে। তখনই সুশীলকে গ্রেফতার করা হল এবং পরে তাকে হাজির করা হল আদালতে। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তার প্রতি ১৫ ঘা বেত মারবার আদেশ দিলেন। সেদিনই সুশীলকে বহুলোকের সামনে বেত মারা হল।

এই সব কারণে বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডের ওপর ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছিল। তখনই কলকাতায় তাঁকে মারবার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এরপর কিংসফোর্ড বদলী হয়ে গেলেন মজঃফরপুরে। তখন সেখানেই তাঁকে বোমা ফেলে মারবার চেষ্টা হল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কিংসফোর্ড বেঁচে গেলেন।

পুলিস ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে ধরে ফেলল। প্রফুল্ল ধরা পড়তেই নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল।

এই ব্যাপার নিয়ে কলকাতায় পুলিস-মহলে ভীষণ কর্মতৎপরতা শুরু হল। চারদিকে ধরপাকড় ও খানাতল্লাশির প্রচণ্ড হিড়িক পড়ে গেল। ২রা মে তারিখে পুলিস বহু খোঁজাখুঁজি করে মানিকতলা অঞ্চলে মুরারিপুকুর বাগানে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করল। অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়লেন অরবিন্দের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। সেই সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সত্যেন বসু প্রভৃতি বহু বিপ্লবীদলের লোক ধরা পড়লেন।

সারা কলকাতায় ভীষণ হইচই পড়ে গেল।

যে সব যুবকরা ধরা পড়লেন তাঁরা সকলেই জাতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অরবিন্দের সহকর্মী। কাজেই পুলিসের ধারণা

হল যে, বিপ্লবীদের কাজে নিশ্চয়ই অরবিন্দের সাহায্য ও উৎসাহ আছে। কাজেই তারা অরবিন্দকে ধরবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

ওদিকে ধরা পড়ার পর ঐ দলের নেতা বারীন্দ্রকুমার পুলিসের কাছে স্বীকার করলেন যে, তাঁরাই দেশে সশস্ত্র বিপ্লববাদের সৃষ্টি করেছেন। লাটসাহেবের ট্রেন ধ্বংস করার চেষ্টা তাঁদের দ্বারাই হয়েছিল। তাঁরাই কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে পাঠিয়েছিলেন মজঃফরপুরে।

অরবিন্দ তখনও জানেন না যে তাঁর ভাগ্যে কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে!

১লা মে তারিখে তিনি বসে ছিলেন 'বন্দে মাতরম্' অফিসে। এমন সময় এলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তাঁর হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামটি অরবিন্দের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখো।

অরবিন্দ পড়ে দেখলেন—মজঃফরপুরে একটি বোমা ফেটেছে, তার ফলে নিহত হয়েছেন দুটি ইওরোপীয়ান স্ত্রীলোক।

অরবিন্দ মুখ গম্ভীর করে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্যামসুন্দর বললেন—অবস্থা তাহলে গুরুতর! কি বলো?

অরবিন্দ বললেন—হ্যাঁ, গুরুতর তো বটেই!

আবার তিনি মুখ গম্ভীর করে ভাবতে লাগলেন।

তখনও অরবিন্দ জানতেন না এই সব ব্যাপারে সন্দেহের মুখ্যস্থল তিনিই। পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্তনেতা তিনি। তখনও তিনি জানতেন না, ঐ দিনই তাঁর জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা।

সেদিনই 'এম্পায়ার' কাগজে অরবিন্দ পড়লেন, পুলিস কমিশনার

বলেছেন, আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত; তাদের শীগ্গিরই গ্রেফতার করা হবে।

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়েছিলেন বিপ্লবীদলের লোকদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর মতিভ্রম হল। তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজসাক্ষী। পুলিসের কাছে বললেন—বিপ্লবীদের সঙ্গে অরবিন্দের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

সে কথা শোনামাত্রই পুলিস অরবিন্দ-গ্রেফতারের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

অরবিন্দ সেদিন রাত্রে গ্রে স্ট্রীট ও রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের মোড়ের বাড়িতে ঘুমুচ্ছিলেন।

শেষ রাতে প্রায় পাঁচটার সময় তাঁর বোন সরোজিনী দেবী সন্ত্রস্তভাবে তাঁর ঘরে ঢুকে ডাকতে লাগলেন—দাদা, ওঠো ওঠো, বাড়িতে পুলিস এসেছে।

ডাকাডাকিতে অরবিন্দের ঘুম ভেঙে গেল।

কি ব্যাপার, ভাল করে তা বুঝবার আগেই পুলিস বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। কিছু পুলিস রইল বাইরে, তারা বাড়িটি পাহারা দিতে লাগল, যাতে কেউ বাইরে পালিয়ে না যায়।

তারপর সারা বাড়িটি তন্নতন্ন করে পুলিস খানাতল্লাশি চালাতে লাগল।

কোন ঘরেই আপত্তিজনক কিছু পেল না। অরবিন্দের ঘরে এসে তারা ভয়ানকভাবে তল্লাশি শুরু করল। সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

অরবিন্দের লেখা অনেক কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিল। পুলিস মনে করল হয়তো ওগুলো বিপ্লবীদের কাছে লেখা চিঠিপত্র। তাই

সেগুলো উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে লাগল। কিছু সঙ্গে করে নিয়ে গেল—কিছু ফেলে দিল এদিকওদিক ছড়িয়ে।

পুলিসের খামখেয়ালীতে অরবিন্দের জীবনের কী এক অমূল্য জিনিস গেল সেদিন নষ্ট হয়ে!

অরবিন্দের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি জাতীয় জাগরণের উৎস বলে মনে করতেন। বহু লেখায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। অতি যত্নের সঙ্গে তিনি ঘরে রেখেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মাটি।

অথচ খানাতল্লাশির সময় সেই মাটি নিয়ে কী মজার ব্যাপারই না হল!

ক্লার্ক নামে একজন সাহেব পুলিস কর্মচারী ঘরে অন্যান্য জিনিস খুঁজতে গিয়ে কাগজের বাক্সে সেই মাটি দেখতে পেলেন।

তাঁর মনে সন্দেহ হল। এটা কোন ভয়ংকর তেজবিশিষ্ট বিস্ফোরক পদার্থ নয় তো? বোমা বা ডিনামাইটের কোন মালমসলা?

প্রথমে তো সেই মাটি হাতেই ধরলেন না। দূর থেকেই চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

ভাবলেন, রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য এটাকে কেমিস্টের কাছে পাঠাবেন।

মনে সন্দেহ এবং রাগ নিয়ে ক্লার্ক সাহেব অরবিন্দের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন—হোয়াট ইজ ইট? এটা কি?

অরবিন্দ বললেন—ওটাকে নমস্কার কর সাহেব। ওটা ঠাকুর রামকৃষ্ণের পায়ে ছোঁয়া মাটি।

সাহেব কিছু বুঝলেন না। অরবিন্দের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

অরবিন্দ সাহেবের হাতে থাকা অবস্থাতেই মাটির বাক্সটা ঠেকালেন নিজের মাথায়।

ক্লার্ক ভ্যাবাচেকার মত তাকিয়ে রইলেন। তারপর বাক্সটাকে রেখে দিলেন যথাস্থানে। কে জানে কেন তাঁর মনের সন্দেহ ঘুচে গেল।

এই পুলিস বাহিনীর নেতা ছিলেন ক্রেগান নামে একজন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁর আদেশে অরবিন্দের হাতে হাতকড়ি এবং কোমরে দড়ি পরানো হল।

ক্রেগান অরবিন্দের শিক্ষাদীক্ষার কোন খোঁজখবর রাখতেন না। কাজেই অন্য সাধারণ আসামীর সঙ্গে তাঁরা যে রকম আচরণ করতেন অরবিন্দের সঙ্গে তার চেয়ে ভাল আচরণ করা সংগত মনে করলেন না।

ক্রমাগত তিনি রুক্ষ এবং অভদ্র আচরণ করে যেতে লাগলেন। অরবিন্দ কোনরূপ প্রতিবাদ করলেন না, নির্বিকারচিত্তে সহ্য করে গেলেন।

ক্রেগান সাহেবের সঙ্গে একজন বাঙালী সহকারী ছিলেন। তাঁর নাম বিনোদ বাবু। ক্রেগান সাহেবের অশিষ্ট ব্যবহারে সম্ভবতঃ বিনোদবাবু কিছুটা লজ্জিতই হলেন। সাহেবের চৈতন্য সঞ্চারের জন্য তিনি তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন। ক্রেগানের উদ্ধত মূর্তি তখন একটু নরম হল।

তিনি অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—শুনলাম, আপনি নাকি বি. এ. পাস করেছেন। এমন কদর্য বাড়িতে বাস করেন আপনি! ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই, মাটিতে শুয়ে থাকেন। এটা কি লজ্জার কথা নয়।

অরবিন্দ উত্তর করলেন—আমি গরিব, গরিবের মতই থাকি।

ক্রেগান উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তবে কি আপনি ধনী হবার জন্য এসব কাণ্ড করাচ্ছেন?

অরবিন্দ একজন পদস্থ কর্মচারীর এই ধরনের কথায় ক্ষুব্ধ হলেন।

দর্শন দান : শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ
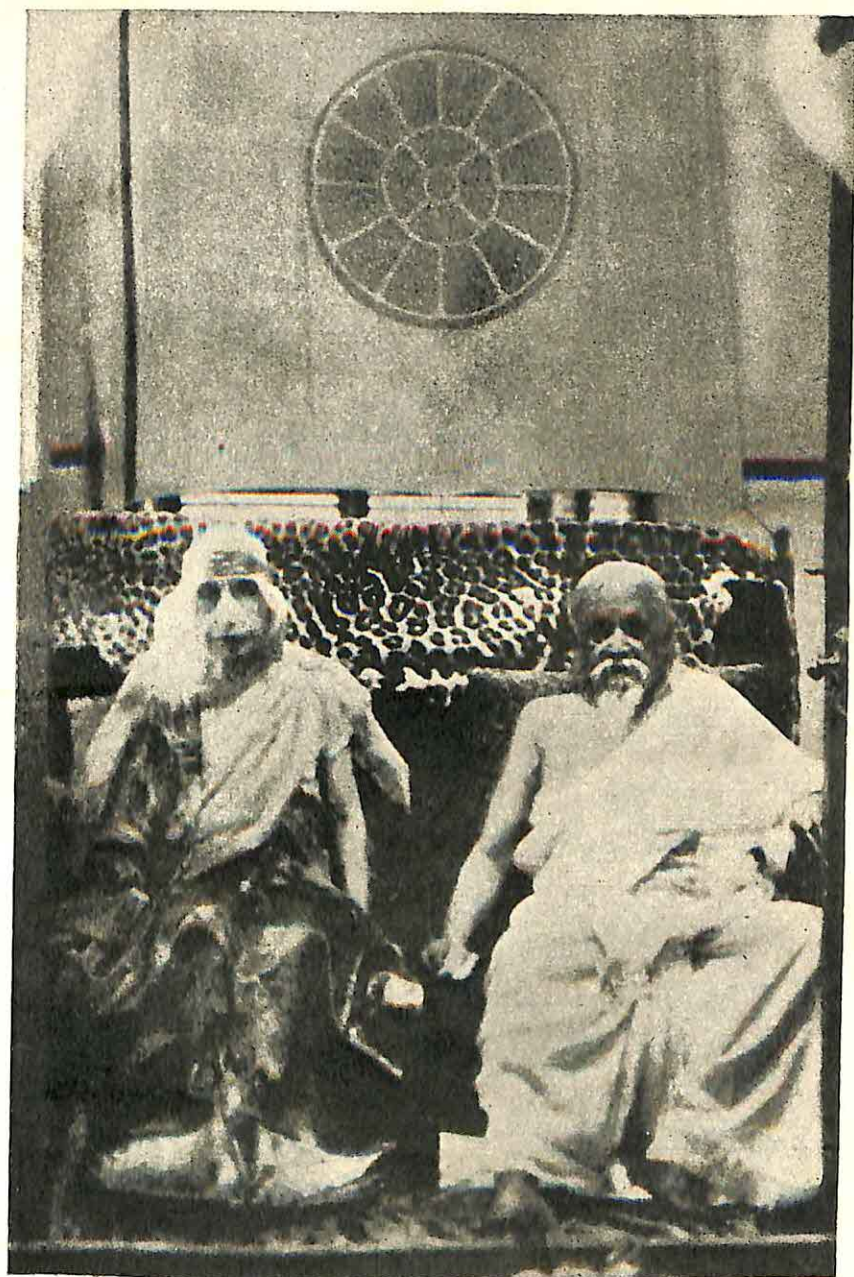
কিন্তু আবার হাসিও পেল। একটু মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার মনে করলেন না।

প্রায় ছয় সাত ঘন্টা ধরে অরবিন্দের সারা বাড়িতে খানাতল্লাশি চালানো হল। এ যেন খানাতল্লাশ নয়—রীতিমত অত্যাচার। পুলিসের ক্ষমতার অপব্যবহার।

বেপরোয়া খানাতল্লাশ ও অরবিন্দের ওপর অশিষ্ট ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে তখনকার দিনে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করেছিলেন।

এরপর অরবিন্দকে সেই এলাকার থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে। তারপর নিয়ে যাওয়া হল রয়েড স্ট্রীটের পুলিস অফিসে।

রয়েড স্ট্রীটের গোয়েন্দা পুলিসের লোকেরা তাঁর কাছ থেকে বোমা, বোমার কারখানা এবং বিপ্লবীদের সম্বন্ধে গোপন তথ্য জানবার জন্য তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুজনের মত মিশতে ও আলাপ করতে লাগল।

অরবিন্দকে ধর্মপরায়ণ জেনে তারা ধর্মালোচনার মধ্য দিয়ে আলাপ শুরু করত। তারপর ধীরে ধীরে আসল কথায় এসে পড়ত। তীক্ষ্ণধী অরবিন্দের এসব কৌশল বুঝতে বাকী থাকত না।

একজন গোয়েন্দা অরবিন্দের সঙ্গে ধর্মালাপ করতে করতে কথাচ্ছলে বলল—আপনি নিজে যোগাভ্যাস এবং সাহিত্য আলোচনা নিয়ে থাকেন। আপনার জন্য ওরকম একটি বাগানবাড়ি খুবই দরকার। কিন্তু আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈরির জন্য বাগানবাড়িটি ছেড়ে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি। খুবই ভুল করেছেন।

অরবিন্দ সেই ভদ্রবেশী গোয়েন্দার চাতুরী বুঝতে পেরে উত্তর দিলেন—বাগানে আমার যেমন অধিকার, আমার ভাইয়েরও ঠিক

তেমনি অধিকার। আমিই যে বাগানটি তাকে ছেড়ে দিয়েছি বা ছেড়ে দিলেও বোমা তৈরির জন্য দিয়েছি, এমন কথা আপনি কোথা থেকে শুনলেন ?

গোয়েন্দা তখন এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হল না।

সন্ধ্যার পর অরবিন্দকে রয়েড স্ট্রীট থেকে লালবাজার পুলিস অফিসে নিয়ে আসা হল।

হ্যালিডে সাহেবের ঘরে তখন অনেক লোকজন ছিল। সাহেব তাদের চলে যেতে বললেন।

ঘর খালি হয়ে গেলে হ্যালিডে অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—এই হীন কাপুরুষোচিত কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে আপনার কি লজ্জা করে না ?

অরবিন্দ বললেন—আমি লিপ্ত ছিলাম, একথা ধরে নেবার আপনার কি অধিকার ?

হ্যালিডে বললেন—ধরে নিই নি, আমি সবই জানি।

অরবিন্দ বললেন—কি জানেন বা না জানেন তা আপনার মনেই আছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার কোনপ্রকারে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

এর পর হ্যালিডে আর কোন কথা বললেন না।

২রা মে রাত এবং ৩রা মে সারা দিনরাত অরবিন্দের হাজতে কাটল। ৪ঠা মে তাঁকে কমিশনারের সামনে হাজির করা হল, কিন্তু তিনি কমিশনারের কাছে কিছুই বলতে রাজী হলেন না।

৫ই মে তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেট থর্নহিলের এজলাসে হাজির করা হল। সেখানে হঠাৎ দেখা হল তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে।

সম্ভবতঃ সেই আত্মীয় ভদ্রলোক জানতে পেরেছিলেন যে অরবিন্দকে সেখানে নিয়ে আসা হবে, তাই তাঁকে চোখের দেখা দেখবার জন্য তিনি গিয়ে হাজির হলেন।

অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হল।

আত্মীয়টির মুখ চিন্তান্বিত ও বিষণ্ণ।

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ির সবাই বুঝি আমার জন্য চিন্তা করছে?

আত্মীয় জবাব দিল—হ্যাঁ। সবাই ভয়ও করছে!

অরবিন্দ ম্লান হাসি হেসে বললেন—বাড়ির সবাইকে বলো, তারা যেন কোনরকম চিন্তা বা ভয় না করে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, আমি শীগগিরই মুক্তি পাবো।

অরবিন্দের মনে ভগবদ্‌ভক্তি এবং আত্মবিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে তাঁর স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে তাঁর কোন সাজা হবে না, তিনি মুক্তি পাবেন।

অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে সহসা কোন বিপদ ঘটলে সাধারণ মানুষের মন তাতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলে। কেউ কেউ দিশেহারাও হয়ে পড়ে। কিন্তু অরবিন্দের হৃদয় সেরূপ উপাদানে গঠিত ছিল না।

সহসা এমন একটা বিপৎপাতে তিনি ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন বটে, কিন্তু ভয় পান নি। এক মুহূর্তের জন্যও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। তিনি শুধু নিজের মনে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেছিলেন—"আমার বিশ্বাস ছিল, আমার স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদের প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে রক্ষা করবে। তাহলে এমন একটা অভিযোগে আমাকে এখানে আনা হয়েছে কেন?"

অরবিন্দ নীরবে নিজের মনে প্রশ্ন করে স্তব্ধ হয়ে থাকতেন। শুনতে চাইতেন নিজের মন থেকেই তাঁর উত্তর।

একদিন অরবিন্দ সেই প্রতীক্ষাই বুঝি করছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন নিজেই।

অন্তর থেকে শুনতে পেলেন এক বাণী—অপেক্ষা কর, ফলাফল দেখ।

সহসা অরবিন্দের মন যেন এক প্রশান্তিতে ভরে উঠল। শান্ত স্তব্ধ হয়ে ফলাফলের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

থর্নহিলের কোর্ট থেকে অরবিন্দকে আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্রেরণ করা হল।

ম্যাজিস্টেট মামলার বিচারে আগেই তাঁর প্রতি নির্জন কারাবাসের আদেশ দিলেন।

নির্জন এক ঘরে অরবিন্দ হলেন বন্দী।

তাঁর সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ সব ছিন্ন করে দেওয়া হল।

কিন্তু সেটাই হল তাঁর জীবনের পক্ষে পরম আশীর্বাদ।

কারাগারের আশীর্বাদ

১৯০৮ সালের ৫ই মে থেকে শুরু হল অরবিন্দের নির্জন কারাবাস।

এ যেন কারাবাস নয়, বনবাস।

অরবিন্দ নিজেই এ সম্বন্ধে তাঁর কারাকাহিনীতে লিখেছেন—

বলেছি, এক বছর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বছর বনবাস, এক বছর আশ্রমবাস।

অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলাম। উৎকট আশা পোষণ করেছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তা দেখতে পারি নি।

শেষে পরম দয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সব শত্রুকে এক কোপে নিহত করে তার সুবিধা করলেন, যোগাশ্রম দেখালেন। স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে, সেই ক্ষুদ্র সাধন-কুটীরে অবস্থান করলেন।

সেই আশ্রম ইংরেজেরে কারাগার।

আমার জীবনের এই আশ্চর্য বৈপরীত্য বরাবর দেখে আসছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুরা আমার যতই উপকার করুন,....শত্রুই অধিক উপকার করেছেন। তাঁরা অনিষ্ট করতে গেলেন, ইষ্টই হল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পেলাম।

এই ভগবদ্দর্শন একদিনের সাধনা নয়। সাধনা বহুদিনের।

ভগবদ্দর্শনের প্রেরণা অনেক আগেই অরবিন্দের হৃদয়ে জেগে উঠেছিল।

বরোদায় থাকতেই তিনি ছিলেন জ্ঞান-তপস্বী। তখনই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে যোগপথ অবলম্বন করেছিলেন।

একদিন তিনি নর্মদাতীরে ব্রহ্মানন্দ নামে এক মহাযোগীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। এই যোগী কখনও কারুর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। কিন্তু অরবিন্দের দিকে তিনি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

সেই যোগী সেদিন কি দেখতে পেয়েছিলেন অরবিন্দের চোখে-মুখে তা কে জানে?

হয়তো রতন চিনেছিল সেদিন রতনকে!

বরোদায় মহারাষ্ট্রীয় যোগী লেলে ছিলেন অরবিন্দের যোগপথে প্রথম সহায়ক।

লেলে কলকাতায় এসেছিলেন। বারীন্দ্রকুমার তাঁকে মানিকতলার বোমার কারখানা দেখিয়েছিলেন।

লেলে বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সঙ্গীদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা দিতে নিষেধ করেছিলেন। একথাও বলেছিলেন যে তাতে তাঁদের দুর্ভোগ হবে। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার সেই যোগীর নিষেধবাণী গ্রাহ্য করেন নি।

লেলে কলকাতা ছেড়ে যাবার কিছুকাল পরেই পুলিস বোমার কারখানায় হানা দেয়। এরপর লেলের সঙ্গে অরবিন্দের আর দেখা হয় নি।

লেলের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। বারীন্দ্রকুমার পুলিসের হাতে ধরা পড়ে অশেষ যাতনাভোগ

করেছিলেন। অরবিন্দকেও সেই ব্যাপারেই জড়িত হয়ে ভোগ করতে হয়েছিল কারাযন্ত্রণা।

অরবিন্দের কয়েদ-ঘরটি ছিল নয় ফুট লম্বা আর পাঁচ-ছয় ফুট চওড়া। তাতে কোন জানালা ছিল না। সামনে মোটা লোহার গরাদে—যেন একটি খাঁচা। ঐ খাঁচাই হল তাঁর থাকবার নির্দিষ্ট জায়গা।

ঘরের বাইরে একটি ছোট উঠোন। উঠোনটি পাথরে বাঁধানো। উঠোনের চারদিকে ইঁটের উঁচু দেওয়াল, সেখানে কাঠের দরজা। সেই দরজার ওপরে ছোট্ট একটি গোল ছিদ্র। দরজা বন্ধ হলে ঐ ফুটোতে চোখ লাগিয়ে পাহারাদাররা মাঝে মাঝে দেখে কয়েদী কি করছে।

কয়েদ-ঘরটি যেমন মনুষ্যবাসের যোগ্য ছিল না, সেখানকার সাজসরঞ্জামও ছিল সেরূপ অযোগ্য। একখানি থালা আর একটি বাটি ছিল ঘরের অন্যতম আসবাব। ভালো করে মাজা হলে তাঁর ঘরের সেই থালা-বাটি এমন রুপোর মত চকচক করত যে তা দেখে অরবিন্দের চোখ জুড়িয়ে যেত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় থালাটির তলা সমান ছিল না। তাই থালাটায় একটু জোরে আঙুল দিলেই তা আরোব্যোপন্যাসের দরবেশের মত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকত। তখন অরবিন্দের পক্ষে এক হাতে আহার করা আর এক হাতে থালাটা ধরে থাকা ভিন্ন কোন উপায় থাকত না।

থালার চেয়ে বাটিটা অরবিন্দের আরও প্রিয় এবং উপকারী জিনিস ছিল। কারণ বাটিটা অরবিন্দের সব কাজেই লাগত। ওটার জাতবিচার ছিল না। ঐ বাটিতে করে তাঁকে ডাল-তরকারি

খেতে হত, তাতেই জল নিয়ে আঁচাতে হত। জল খেতে হত ঐ বাটিতে এবং শৌচক্রিয়াও ঐ বাটির সাহায্যেই করতে হত।

বাটিটির এরূপ সর্বকর্মসাধনের ক্ষমতার কথা চিন্তা করে সময় সময় অরবিন্দের খুব হাসি পেত।

ঐ বাটি এবং থালা ছাড়া অরবিন্দের ঘরে স্নানের জন্য ছিল একটি বালতি এবং জেলের তৈরী দুটি ময়লা কম্বল। বালতি উঠোনে থাকত এবং সেখানেই অরবিন্দ স্নান করতেন। অধিকাংশ আসামীকেই ঐ এক বালতি জলেই শৌচক্রিয়া থেকে শুরু করে বাসনমাজা ও স্নান সারতে হত। কি শীতে কি গ্রীষ্মে প্রায় রোজই স্নানের সময় জল ফুরিয়ে আসত, আর তখন সামান্য মাত্র জলে অরবিন্দকে ও অন্যান্য কয়েদীদের কাক স্নান করতে হত।

তাতে শীতকালে কোন রকমে চলে গেলেও গরমকালে কোনমতেই শরীর শীতল হত না।

স্নানের ব্যবস্থার চেয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল আরও চমৎকার! অরবিন্দ যখন কয়েদঘরে প্রথম ঢোকেন তখন গরমকাল। তাঁর ঘরে বাতাস প্রায় ঢুকত না বললেই হয়। কিন্তু জ্বলন্ত আগুনের মত গরম রোদ ঘরটিকে তাতিয়ে যেন একটি আগুনের চুল্লি বানিয়ে তুলত। সেই আগুনে যখন গা সেদ্ধ হবার উপক্রম হত তখন অরবিন্দকে পান করতে হত ঐ টিনের বালতির গরম জল। বার বার তিনি ঐ জল পান করতেন তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। কিন্তু তাতে তৃষ্ণা মিটত না। বরং বেশি করে ঘাম হত আর নতুন করে তৃষ্ণায় আকুল হতেন।

কোন কোন কয়েদীর উঠোনে ছিল মাটির কলসী। যাঁদের উঠোনে ঐরূপ মাটির কলসী থাকত তাঁদের কী ভাগ্য! তাঁরা মনে করতেন যে, পূর্বজন্মে বহু ভাগ্যের ফলে তাঁরা ঐভাবে ঠাণ্ডা জল পাবার অধিকারী হয়েছেন।

জেলের মধ্যে কারও ভাগ্যে এই রকম ঠাণ্ডা জল, কারও ভাগ্যে তৃষ্ণার হাহাকার—তা লক্ষ্য করে ঘোর নাস্তিককেও অদৃষ্ট মানতে হত।

গরম জল আর কত পান করা যায়! ক্রমেই বিতৃষ্ণা আসতে লাগল। ধীরে ধীরে জল পান করার অভ্যাস কমাতে লাগলেন অরবিন্দ। তারপর একেবারে তৃষ্ণামুক্ত হলেন।

সেই গরম অগ্নিকুণ্ডের মত ঘরে অরবিন্দের বিছানা ছিল দুটি জেলের তৈরী মোটা ময়লা কম্বল। বালিস মিলত না। কাজেই একটি কম্বল পেতে আর একটি কম্বল পাট করে বালিস তৈরি করে তাতেই শুতে হত।

কিন্তু তাতে কি আর শোয়া যায়? অসহ্য গরম! সেই গরমে কম্বল পর্যন্ত গরম হয়ে যেত। তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে শরীর শীতল করতেন। বেশ আরাম লাগত তখন।

মা বসুন্ধরার কোলের পরশ যে কত শীতল, কত আনন্দ-দায়ক সেই সময়ে অরবিন্দ বেশ উপলব্ধি করতে পারতেন। তবে জেলের মাটির মেঝে তেমন কোমল ও মসৃণ ছিল না। কাজেই কিছুক্ষণ পরেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে আবার কম্বলের বিছানাতেই তিনি আশ্রয় নিতেন।

দারুণ গরমে কম্বলের বিছানায় শুয়ে গা জ্বালা করত, অথচ কঠিন মেঝে শীতল হলেও সেখানে বেশীক্ষণ শুয়ে থাকা চলত না।

যেদিন বৃষ্টি হত সেদিন অরবিন্দের খুব মজা হত। অথচ বৃষ্টির দিনে অসুবিধারও অন্ত ছিল না। জলে ঘরটি ভেসে যেত। যতক্ষণ না জল শুকাত, ততক্ষণ বিছানা কাঁধের ওপর তুলে অরবিন্দকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

তবু মজা হত অরবিন্দের! কারণ ঐ রকম ঝড়-বৃষ্টির দিনেই

তাঁর খাঁচার মত ঘরে বেশ হাওয়া ঢুকত। তাতে ঘরের নিদারুণ তাপের মাত্রা কমে যেত।

জেলখানার খাওয়াদাওয়াও ছিল অদ্ভুত। মোটা মোটা নানা রঙের চালের ভাত, তাতে কাঁকর, মাটি, চুল, পোকা ইত্যাদি কত বিচিত্র দ্রব্য যে মেশানো থাকত তার অন্ত নেই। ডালের ভেতর ডালের অংশ খুঁজে পাওয়া ছিল গবেষণার ব্যাপার। সাদা চোখে তাকে জল বলেই ভ্রম হত। তরকারির মধ্যে ছিল ঘাস-পাতা সুদ্ধ শাক। তার রঙের বাহার দেখলে অবাক্ হতে হত। শাকের কালো কয়লার মত মূর্তি দেখে অরবিন্দ প্রথম দিনেই তাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করে বর্জন করেছিলেন।

জেলখানায় সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারি জুটত। আর একবার হেঁসেলে যে তরকারি ঢুকত তা আর সহজে বিদায় নিতে চাইত না।

তখন ছিল শাকের রাজত্বকাল। কাজেই সপ্তাহ, পক্ষ, মাস পার হয়ে গেল, দুবেলা ডাল আর শাকের তরকারি খাওয়া কারুর ভাগ্য থেকে ঘুচলো না।

এই একঘেয়ে খাওয়া দেখতে দেখতে জগৎ যে পরিবর্তনশীল একথাও বুঝি অরবিন্দ ভুলে গিয়েছিলেন!

জেলখানার আর একটি ভয়াবহ জিনিস ছিল লপসী। যিনি একবার তখনকার দিনের সুসভ্য ব্রিটিশ জাতির সেই বিচিত্র হোটেলে পদার্পণ করেছেন, তিনি এই অপূর্ব জিনিসটিকে ভুলতে পারবেন না।

যেদিন অরবিন্দকে জেলে নিয়ে যাওয়া হল তার পরদিন সকালেই তিনি দেখলেন একজন কালো জোয়ান লোক বালতি থেকে সাদা সাদা কি খানিকটা তাঁদের থালার ওপর ঢেলে দিয়ে গেল।

ওটাই সকালবেলার জলখাবার—নাম লপসী।

লপসী জিনিসটা যে কী তা বিপ্লবী যুবকরা কোনদিন জানত না। জেলখানাতেই এই জিনিসটির জন্ম, সেখানেই তার শেষকৃত্য!

অরবিন্দ খাবারটার নাম লপসী শুনে অবাক্ হয়ে বললেন—লপসী! এ আবার কোন্ জাতের খাবার?

পরক্ষণেই একজন যুবক জিনিসটি পরীক্ষা করে বলে উঠল—ওহো, এ যে দেখছি ফেন-মেশানো ভাত!

পরদিন লপসীর রূপও পরিবর্তন হল। ডালের সঙ্গে মিশে ধারণ করল খিচুড়ির রূপ। তৃতীয় দিন দেখা গেল লপসীর রাজকীয় রূপ, অল্প গুড়ে মেশানো ধূসরবর্ণ। এই জিনিসটি তবু কোন রকমে গলাধঃকরণ করা যেত। অন্য দুই মূর্তিকে মুখে দিতে গেলে পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবার উপক্রম হত।

শুধু খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা নয়, নিশ্চিন্তে নিদ্রাভোগ করাও কারাবাসের নিয়ম ছিল না। কারণ তাতে কয়েদীর আরামপ্রিয়তা বেড়ে যাবার আশঙ্কা ছিল।

সেজন্যই নিয়ম ছিল প্রহরীরা যতবার পাহারা বদল করত, ততবারই হাঁক-ডাক করে কয়েদীদের জাগিয়ে তুলত। যতক্ষণ না ঘুমন্ত কয়েদীরা সেপাইয়ের হাঁক-ডাকে জেগে উঠে সাড়া দিত ততক্ষণ রেহাই ছিল না—হাঁক-ডাক পুরোদমে চলত। সাড়া দিলে তবে থামত।

সেপাইরা অরবিন্দকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করত—বাবু, ভাল আছেন তো?

গভীর রাতে ডেকে তুলে অমন ভাবে কুশল প্রশ্ন করলে কারুর কি আনন্দ হয়? বরং বিরক্তিই আসে।

অনেকদিন এরকম অত্যাচার সহ্য করলেন অরবিন্দ। শেষে ভাবলেন এর একটা দাওয়াই খুঁজে বের করতে হবে।

দাওয়াই আবিষ্কার হল। সেপাইরা হাঁক-ডাক করতে এলেই তিনি কষে ধমক লাগাতেন। দু'চার দিন ধমক দিতে দিতে দেখলেন যে দাওয়াই-এর ফল ফলতে আরম্ভ করেছে।

এরপর সেপাইরা আর অরবিন্দকে ডাকত না। ধীরে ধীরে সেই প্রথাটাই উঠে গেল। অরবিন্দ রেহাই পেলেন। রেহাই পেল অন্যান্য কয়েদীরাও।

তখনকার দিনে কারাগার কি করে মানুষকে অমানুষ করত, কয়েদীকে পশু অপেক্ষাও দুঃসহ জীবন যাপন করতে হত তা পাঠ করে আধুনিক যুগের মানুষও হয়তো বিস্মিত হবেন। কিন্তু অরবিন্দ সেই অমানুষিক ক্লেশভোগে একটুও কাতর হন নি।

অনেকেই হয়তো ভেবে বিস্মিত হবেন, বাল্যকালে যিনি বিলাতের স্বাধীন আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন তিনি কি করে তখনকার দিনের কারাগারে দুঃসহ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর বরোদার সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন-যাত্রার কথা জানেন তাঁরা মোটেই এতে বিস্মিত হবেন না। অরবিন্দ স্বেচ্ছায় দুঃখের জীবনযাত্রাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। বরোদায় যথেষ্ট টাকা উপার্জন করতেন, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' থেকে নিতেন অতি সামান্য টাকা এবং বলতে গেলে শাকভাতে জীবন-ধারণ করতেন।

অরবিন্দ বলতেন—যে দেশের অর্ধেক লোক অর্ধাহারে থাকে সে দেশে শাকভাত খাওয়াই উচিত।

তাঁর এই দারিদ্র্যব্রত লক্ষ্য করেই তাঁকে গ্রেফতার করবার সময়

ক্রেগান সাহেব বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, তাঁর মত শিক্ষিত লোক এই অবস্থায় কি করে থাকতে পারেন।

জেলখানায় দুঃখকষ্টের অবধি ছিল না। তবু অসীম শক্তিবলেই অরবিন্দ সেই দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

যেদিন কয়েদীর বিচিত্র পোশাক পরে পিঞ্জরে ঢুকে সেখানে থাকবার বন্দোবস্ত দেখলেন তখন অতি দুঃখেও তাঁর হাসি পেয়েছিল।

অরবিন্দ ইংরেজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করে তাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগেই বুঝে নিয়েছিলেন, তাই তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্যান্বিত বা দুঃখিত হন নি।

একেই বলে ভাগ্যচক্র! যিনি সিভিল সার্ভিসে চাকরি নিলে বহু লোককে এরূপ কারাগারে পাঠাতেন, তিনি নিজেই সেই কারাগারের যাতনা ভোগ করতে লাগলেন।

অরবিন্দ ব্রিটিশ চরিত্র সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তা ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রণোদিত হয়ে নয়। যে জাতি জগতে সভ্য বলে পরিচয় দেয় সেই জাতির ব্যবস্থায় ভারতীয় কারাগারে নানারূপ অব্যবস্থা এবং অমানুষিক রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল বলেই তিনি কঠোর সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অরবিন্দ আলিপুরের জেলে বন্দী ছিলেন, সেই জেলেই আর একজন বন্দী ছিলেন—বৃদ্ধ গোয়ালা।

লোকটি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অথচ বিচারের কী প্রহসন! ডাকাতিতে লিপ্ত ছিলেন সন্দেহে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

লোকটি অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারেন না। ভগবানের

ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। শিক্ষাসুলভ বিনয়, ধৈর্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ তাঁর ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে।

এই বৃদ্ধের ভাব দেখে অরবিন্দের বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল।

বৃদ্ধের চোখে সর্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব—মুখে সর্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধ কষ্টভোগের কথা পাড়েন। স্ত্রী-ছেলেদের কথা বলেন। কবে ভগবান তাঁকে মুক্তি দেবেন, কবে তিনি স্ত্রী-ছেলেদের মুখ দেখতে পাবেন—এই সব ভাবও প্রকাশ করেন।

অথচ কখনও অরবিন্দ তাঁকে নিরাশ বা অধীর হতে দেখেন নি।

বৃদ্ধের যত ভাবনা নিজের জন্য নয়, পরের সুখ-সুবিধার জন্য। দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁর কথায় কথায় প্রকাশ পায়, অপরের সেবা করা যেন তাঁর স্বভাবধর্ম।

বৃদ্ধের অসীম ভক্তিশ্রদ্ধা অরবিন্দের প্রতি। অরবিন্দকে তিনি সেবা করতে চান—তাঁকে সাহায্য করতে চান নানা কাজে। কিন্তু অরবিন্দ ভয়ানক লজ্জা পান তাঁর সেবা ও সাহায্য নিতে।

অরবিন্দ বলেন—আহা, আপনি এসব করেন কি? আপনি যে বয়সে আমার চেয়ে বড়।

বৃদ্ধ হেসে হেসে বলেন—আপনাকে সেবা করব তাতে ক্ষতি কি? আপনি যে দেবতা।

অরবিন্দ অতি গর্বের সঙ্গে তাঁর কারাকাহিনীতে এই কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষীদের মধ্যে—আমরা যাকে অশিক্ষিত ছোটলোক বলি, তাদের মধ্যে এরূপ হিন্দুসন্তান পাওয়া যায়, তাতেই হিন্দুধর্মের গৌরব। আর্যশিক্ষার অতুল গুণ প্রকাশ এতে রয়েছে,

এবং এতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক বলে মনে হয়। শিক্ষিত যুবমণ্ডলী এবং অশিক্ষিত কৃষক-সম্প্রদায় এই দুটি শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, তাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্যজাতি গঠিত হবে।

অচিরেই অরবিন্দ নরের মধ্যে নারায়ণ প্রত্যক্ষ করবার অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

কারাগারে প্রবেশ করবার পরই তাঁর যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি।

....এখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গী স্বরূপ, যেন কাছে এসে ব্রহ্মময় হয়ে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হত।

উঠোনের দেওয়ালের গায়ে একটি গাছ ছিল, কী নয়নরঞ্জক ছিল তার নীলিমা, সেই নীলিমায় আমার প্রাণ জুড়িয়ে যেত।

ছয় ডিগ্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে শাস্ত্রী ঘুরে বেড়াত, তার মুখ যেন কতদিনের পরিচিত। তার ঘোরাফেরা পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মতই প্রিয় বলে বোধ হত।

ঘরের পার্শ্ববর্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সুমুখ দিয়ে গরু চরাতে নিয়ে যেত। সেই গরু ও গোপাল ছিল আমার নিত্য দিনের প্রিয় দৃশ্য।

আলিপুরের নির্জন কারাবাসে অপূর্ব প্রেমশিক্ষা লাভ করলাম। এখানে আসবার আগে মানুষের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশুপাখির দুঃখে আমার মনের উৎস থেকে কোন করুণাধারা প্রবাহিত হত না।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় মহিষের প্রতি গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা কী সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ সেই কবিতা পড়ে আমার মনে তো কোন প্রেম জাগে নি। বরং তা ভাবের অভিব্যক্তি বলেই মনে হয়েছে।

কিন্তু একি হল!

সকল শ্রেণীর জীবের ওপর এত মমতা কোথা থেকে এল।

গরু পাখি এমনকি পিপীলিকা দেখেও প্রাণে এত আনন্দের শিহরন জাগে কেন?

এই প্রেমের অভিজ্ঞতা বাসুদেবের বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করবারই পূর্বাভাষ।

কেন এমন হল?

এটা কি কারাগারের আশীর্বাদ না নির্জনতার মহিমা?

প্রথম কয়েকদিন নির্জন কারাবাসে অরবিন্দ ছিলেন নিতান্ত নিঃসঙ্গ। কোন প্রয়োজনীয় জিনিস বা বইখাতাও তাঁকে সঙ্গে রাখতে দেওয়া হয় নি।

এমার্সন সাহেব এসে বাড়ি থেকে ধুতি, জামা ও পড়বার বই আনাবার অনুমতি দিয়ে গেলেন। অরবিন্দ তখন জেলখানার কর্মচারীদের কাছ থেকে কালি কলম ও জেলের ছাপানো চিঠির কাগজ আনিয়ে নিলেন।

তখন অরবিন্দ চিঠি লিখলেন তাঁর মেসোমহাশয় 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। অনুরোধ করলেন ধুতি, জামা ও পড়বার বইয়ের মধ্যে গীতা ও উপনিষদ যেন পাঠিয়ে দেন।

তিন চার দিন পরেই গীতা ও উপনিষদ এসে পৌছল। তার আগেই অরবিন্দ নির্জন কারাবাসের মহত্ত্ব বুঝবার যথেষ্ট অবসর পেয়েছিলেন। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির ধ্বংস হয় এবং তা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা তিনি বুঝতে পারলেন এবং সেই অবস্থাতেই ভগবানের অসীম দয়া লাভের কিরূপ সুযোগ হয় তাও হৃদয়ংগম করলেন।

কারাগারে আসবার আগে সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায়

একঘণ্টা ধ্যান করবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জন কারাবাসে কোনও কাজ না থাকায় বেশীক্ষণ ধ্যানে থাকবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু চঞ্চল মনকে বেঁধে রাখা কি এতই সহজ! কোনমতে তিনি দেড়ঘণ্টা বা দুঘণ্টা একভাবে রাখতে পারতেন, তারপরেই মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত, দেহও অবসন্ন হয়ে পড়ত।

প্রথমে নানা চিন্তা নিয়ে থাকতেন অরবিন্দ। কিন্তু সেই বিষয়শূন্য অসহনীয় অকর্মণ্যতায় মন ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি রহিত হতে লাগল।

তখন মনের কী এক দুঃসহ অবস্থা।

অরবিন্দ নিজেই তা বর্ণনা করেছেন।

...সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বারের চারদিকে ঘুরছে, অথচ প্রবেশপথ নিরুদ্ধ। দু একটি যদি কখনো প্রবেশ করে, সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হয়ে পালিয়ে যায় নিঃশব্দে।

এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় সে কী মানসিক যাতনা!.......

আবার ধ্যানে বসলেন অরবিন্দ। কিন্তু ধ্যান কিছুতেই হল না। সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অবসন্ন ও দগ্ধ হতে লাগল।

ঘরের দেয়ালে তখন দু'দল পিপীলিকার মধ্যে যুদ্ধ চলেছে। একদল লাল আর একদল কালো।

শক্তির লড়াইয়ে একদল হেরে গেল। বিজিত দল করতে লাগল পরাজিতের উপর আক্রমণ।

অরবিন্দের তা সহ্য হল না। তিনি যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিলেন। অত্যাচারিতদের রক্ষা করলেন।

যা কোনদিন ভাবতেন না, তাও ভাবতে লাগলেন। যা কোনদিন করতেন না তাও করতে লাগলেন।

তবু অলস দিনগুলি কাটাবার কোন উপায় আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না অরবিন্দ।

মনকে বুঝিয়ে দিলেন, জোর করে চিন্তা আনলেন, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হতে লাগল, হাহাকার করতে লাগল।

সেই দুঃসহ অবস্থার কথা অরবিন্দ নিজেই বলেছেন—

কাল যেন মনের উপর অসহ্য ভার হয়ে পীড়ন করছে, সেই চাপে চূর্ণ হয়ে সে হাঁপ ছাড়বার শক্তিও পাচ্ছে না।

কথা আছে, যে নির্জনতা সহ্য করতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু—এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত।

ইতালীর রাজহত্যাকারী ব্রেসীর কী শোচনীয় পরিণামই না ঘটেছিল!

বিচারকগণ তাঁকে প্রাণে না মেরে সাত বছরের জন্য নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত করলেন।

কিন্তু সেটাই হল তাঁর মর্মান্তিক শাস্তি।

এক বছর পার হতে না হতেই ব্রেসী হয়ে গেল উন্মাদ।

অরবিন্দ ভাবতে লাগলেন—সেই অবস্থা কি আমারও হবে?

...তখনও বুঝতে পারিনি ভগবান আমার সঙ্গে খেলা করছেন, খেলার ছলে আমাকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিচ্ছেন।

....কয়েকদিন পর বুঝতে পারলাম, ভগবান আমার মনের দুর্বলতা মনের সামনে তুলে তা চিরকালের জন্য বিনাশ করছেন।

যে যোগাবস্থা চায় তার পক্ষে জনতা ও নির্জনতা সমান হওয়া উচিত।

বাস্তবিক তাই হল। অল্পদিনের মধ্যেই দুর্বলতা ঘুচে গেল। এখন বোধহয় দশবছর একা থাকলেও মন টলবে না।

মঙ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও এমনি করে ঘটান পরম মঙ্গল।

একদিন অপরাহ্ণে অরবিন্দ চিন্তা করছিলেন। চিন্তার পর চিন্তা এসে মনকে ভারাক্রান্ত করছিল।

হঠাৎ চিন্তাগুলি এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হতে লাগল যে তিনি বুঝতে পারলেন যে চিন্তার ওপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হতে চলেছে। তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হলেন তখন তাঁর মনে হল বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত হয় নি বা এক মুহূর্তও ভ্রষ্ট হয় নি। বরং সে শান্তভাবে মনের এই বিচিত্র ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করছিল। উন্মত্ততা-ভয়ে ত্রস্ত হয়ে অরবিন্দ তা লক্ষ্য করতে পারেন নি।

প্রাণপণে তখন অরবিন্দ ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করতে বললেন।

সেই মুহূর্তেই তাঁর সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হতে লাগল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন হল যে এর আগে তিনি জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করতে পারেন নি। শিশু মায়ের কোলে যেমন আশ্বস্ত হয়ে নির্ভয়ে শুয়ে থাকে, তিনিও যেন বিশ্বজননীর কোলে তেমনি শুয়ে রইলেন।

সেদিন থেকে অরবিন্দের কারাবাসের কষ্ট ঘুচে গেল।

সেদিন থেকে অরবিন্দ বিশ্বের অণু-পরমাণুতে সর্বত্র ভগবানের মূর্তির বিকাশ দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ঘরে বাইরে, গাছে, প্রাচীরে, মানুষে, পশুতে, পাখিতে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি করতে লাগলেন।

এরূপ করতে করতে এমন ভাব হয়ে যেত যে কারাগার আর কারাগারই বোধ হত না। সেই উঁচু প্রাচীর, লোহার গরাদে, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত গাছপালা, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নয়। তারা যেন সর্বব্যাপী

চৈতন্যপূর্ণ হয়ে সজীব হয়ে উঠেছে। তারা যেন তাঁকে ভালবাসে, তাঁকে আলিঙ্গন করতে চায়।

চমকে উঠলেন অরবিন্দ! ঐ তো সেই গাছের তলায় ভগবান আনন্দের বাঁশি বাজাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন!

ঐ তো, তিনিই তো তাঁর হৃদয়টাকে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন।

আহা, কী আনন্দ! কী মধুর!

কে যেন তাঁকে আলিঙ্গন করছে, কে যেন তাঁকে কোলে করে রয়েছে।

সারা মনে প্রাণে কী নির্মল শান্তি!

এ শান্তি আগে কোথায় ছিল?

প্রাণের কঠিন আবরণ যেন খুলে গেল। সর্বজীবের ওপর বইতে লাগল প্রেমস্রোত।

প্রেমের সঙ্গে দয়া, করুণা, অহিংসা সবকিছু সাত্ত্বিক ভাব রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করতে লাগল।

ভয় দূর হল, আনন্দ বেড়ে গেল।

দুশ্চিন্তা, যন্ত্রণা সব কিছু গেল ঘুচে।

এটাই হল অরবিন্দের ভূমা, বিশ্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ ও মহৎ আত্মার উপলব্ধি।

অন্য এক জীবন

অরবিন্দের জন্য একটি কোণ নির্দিষ্ট ছিল। সারাটা প্রাতঃকাল তিনি সেখানে সাধন-ভজনের মধ্যে ডুবে থাকতেন।

ছেলেরা চিৎকার করে তাঁকে বিরক্ত করলেও তিনি থাকতেন নির্বিকার। কোন কোলাহল তাঁর ধ্যানকে ভঙ্গ করতে পারত না।

অপরাহ্নে দু-তিন ঘণ্টা পায়চারি করতে করতে উপনিষদ বা গীতা পাঠ করতেন।

জেলখানায় কয়েদী ও প্রহরীদের মধ্যে চেঁচামেচি ও ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকত। অরবিন্দ সেই সব হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যেও বসে থাকতেন নিশ্চল স্থানুর মত।

জেলের অন্যান্য লোকেরা অরবিন্দের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে যেত। কী অদ্ভুত এই লোকটি!

জেলের প্রহরীরাও অবাক্ হয়ে দেখতো অরবিন্দের কাণ্ডকারখানা। তাঁর আচরণে প্রথম প্রথম তারা কৌতুক বোধ করত। কিন্তু পরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টি নিয়েই তাকাতো অরবিন্দের দিকে।

অরবিন্দ যে জেলে ছিলেন সেই জেলে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায়ও বন্দীজীবন যাপন করছিলেন।

মাথায় মাখবার জন্য কোন কয়েদীকেই তেল দেওয়া হত না। কাজেই সবার চুল হয়ে উঠেছিল লালচে ও রুক্ষসুক্ষ।

কিন্তু অরবিন্দের চুল সব সময়েই চকচক করত।

অনেকে ভাবত, অরবিন্দ নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে মাথায় তেল মাখেন। হয়তো প্রহরীদের সঙ্গে তাঁর কোন বন্দোবস্ত আছে।

উপেন্দ্রনাথ একদিন সাহসে ভর করেই জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি চান করবার সময় মাথায় তেল দেন?

অরবিন্দ সে কথা শুনে হেসে উঠলেন। বললেন—হঠাৎ এমন প্রশ্ন করলেন যে!

উপেন্দ্রনাথ বললেন—না, অমনিই জিজ্ঞেস করলাম।

অরবিন্দ বললেন—আমি তো চানই করি না, তেল মাখবো কেন?

উপেন্দ্রনাথ ভয়ানক অবাক্ হয়ে গেলেন। বললেন—তাহলে আপনার চুল এত চকচক করে কেন?

অরবিন্দ ধীর গম্ভীরভাবে বললেন—এসব সাধনার ফল। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়।

উপেন্দ্রনাথ সেদিন থেকে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন অরবিন্দের জীবনে ঘটছে ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন।

এ জগতের মানুষ অরবিন্দ নন—তিনি যেন শাপভ্রষ্ট দেবতা।

একদিন বসে থাকতে থাকতে উপেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন, অরবিন্দের চোখ যেন কাচের চোখের মত স্থির হয়ে আছে, তাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই।

উপেন্দ্রনাথ কয়েকজনকে চুপি চুপি ডেকে তা দেখালেন। অবাক্ হলেন সবাই। কিন্তু সাহস করে কেউ কোন কথা অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

শেষে শচীন নামে একটি ছেলে আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—আপনি সাধন করে কি পেলেন?

অরবিন্দ তার কাঁধের ওপর হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন—যা খুঁজেছিলাম তা পেয়েছি।

অরবিন্দকে যখন কোন দরকারে বাইরে নিয়ে যাওয়া হত, তখন প্রহরীরা নিয়ে যেত তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে। তা দেখে যে-কোন লোকেরই ধৈর্যধারণ করা কঠিন হত।

কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন একেবারে অবিচল, মুহূর্তের জন্যও কোনোদিন তাঁর ভাবান্তর দেখা যায় নি।

বিচারের সময়ও সকলে তাঁর অবিচল ভাব দেখে চমৎকৃত হতেন। কোনদিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, যেন যোগাসনে বসে আছেন।

অরবিন্দকে কিছুদিন সেলের বাইরে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে যাবার অনুমতি দেওয়া হল।

ক্ষণিকের জন্য যেন এক মুক্তির পরোয়ানা।

তখনকার সেই অনুভূতি বর্ণনা করে অরবিন্দ বলেছিলেন—

"যখন আমি বাইরে বের হলাম, তখন ভগবানের শক্তি যেন আবার আমার মধ্যে প্রবেশ করল। যে জেল আমাকে মনের জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উঁচু দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব।"

বিচার

আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শুরু হল অরবিন্দের বিচার।

বিচার নয়—যেন পুরাকালের এক অশ্বমেধ যজ্ঞ।

সরকার পক্ষে ব্যারিস্টার নিযুক্ত হলেন মিঃ নর্টন। তিনি নানারূপ কূটজাল বিস্তার করে অরবিন্দের দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি নানাপ্রকার অন্যায়ের আশ্রয় নিতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। বহু জাল চিঠিপত্র ও মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে অরবিন্দকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দেবী পক্ষসমর্থনের সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। তিনিই চালাতে লাগলেন মামলার খরচ। কিন্তু কিছুদিন খরচ চালানোর পরই তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়লেন।

তখন বাইরে থেকে অযাচিত ভাবে অর্থসাহায্য আসতে লাগল। কিন্তু সে অর্থও অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল।

এই সংকটময় মুহূর্তে এক মহাপুরুষ এসে যেন ভগবানের আশীর্বাদের মতই অরবিন্দকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

চিত্তরঞ্জন তখনও দেশবন্ধু আখ্যা লাভ করেন নি। তখনও তিনি দেশসেবায় অবতীর্ণ হন নি। তখন তিনি সবেমাত্র ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে লোকজনের নিকট পরিচিত হচ্ছেন। পসার-প্রতিপত্তি তখনও তাঁর তেমন হয় নি, দেশের লোক তখনও তাঁকে ভাল করে চেনে নি।

চিত্তরঞ্জন জানতেন, এই মামলা চালাতে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হবে, অথচ অর্থাগম কিছুই হবে না। বরং অন্য মকদ্দমায় হাত দিতে না পারায় অর্থের দিক দিয়ে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে।

তবু স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে ভারতের এই মুক্তিকামী মহাপুরুষ অরবিন্দের পক্ষে এসে দাঁড়ালেন।

চিত্তরঞ্জনকে মামলা পরিচালনের ভার নিতে দেখে অরবিন্দ সেদিন আনন্দে অধীর হয়ে বললেন—স্বয়ং নারায়ণ আমার সাহায্যে এসেছেন।

নিয়তির কী বিচিত্র পরিহাস!

যে অরবিন্দ আই. সি. এস.-এর চাকরি নিলে নিজেই বিচারকের আসনে বসতে পারতেন—তিনি আজ দাঁড়িয়েছেন আসামীর কাঠগড়ায়। আর আই. সি. এস.-এর গ্রীক ও ল্যাটিন পরীক্ষায় যিনি অরবিন্দের নীচের স্থান লাভ করেছিলেন সেই বীচ্‌ক্রফ্‌ট হলেন এই মামলার বিচারক।

এই বীচ্‌ক্রফ্‌ট ছিলেন আই. সি. এস. পরীক্ষায় অরবিন্দের সহপাঠী। তাতে গ্রীক ও ল্যাটিন পরীক্ষায় অরবিন্দই পেয়েছিলেন প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব আর বীচ্‌ক্রফ্‌ট হয়েছিলেন দ্বিতীয়। অথচ ভাগ্যচক্রে তিনিই আজ অরবিন্দের বিচারক।

চিত্তরঞ্জন তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা ও অকাট্য যুক্তিতে সরকার পক্ষের সব রকম সাক্ষ্য ও প্রমাণ খণ্ডন করে দিতে লাগলেন।

নর্টন সাহেব এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে বিপ্লবীদের নেতা বারীন্দ্রকুমার যখন অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অন্যতম প্রধান আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যখন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা

পরিচালনায় অরবিন্দের প্রধান সহকর্মী, তখন এদের কাজেও অরবিন্দের যোগাযোগ আছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের যুক্তির কাছে নর্টন সাহেবের সেই যুক্তিও অসার বলে প্রতিপন্ন হল।

তখন নর্টন অন্য পথ ধরলেন। অভিযোগ করলেন, ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃই অরবিন্দ জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করছেন। অরবিন্দের কার্যকলাপ, লেখা ও বক্তৃতা সব কিছুরই ভেতর আছে দেশের যুবশক্তিকে ইংরেজদের ওপর উত্তেজিত করে তোলার চক্রান্ত। তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের কাছে এইসব অভিযোগও ব্যর্থ হয়ে গেল।

নর্টন অবশেষে একখানি পোস্টকার্ড আদালতে দাখিল করলেন। তিনি বললেন, এটি অরবিন্দের কাছে লেখা তাঁরই ছোট ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমারের পত্র। পত্রটিতে লেখা—"হঠাৎ প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া সর্বত্র মিষ্টদ্রব্য (sweets) প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। আমি এখানে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

মিঃ নর্টন এই 'sweet' বা মিষ্টদ্রব্যের ব্যাখ্যা করলেন 'বোমা'। তিনি বললেন, এই পত্রটি পুলিস পথে আটক করেছে। বোমাগুলিকে সময়মত কাজে লাগাবার নির্দেশই বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দকে দিয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন এই অভিযোগও খণ্ডন করলেন। প্রমাণ করলেন, পত্রখানি আদৌ বারীন্দ্রকুমারের লেখা নয়। এই পত্রখানি জাল।

এভাবে সরকার পক্ষ ও পুলিস পক্ষ থেকে যত অভিযোগই আনা হল তীক্ষ্ণধী চিত্তরঞ্জন সব কিছুই মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিলেন।

প্রায় এক বছর কাল চিত্তরঞ্জন ধরতে গেলে বিনা পারিশ্রমিকে অরবিন্দের জন্য যে ত্যাগস্বীকার করলেন তার তুলনা হয় না।

এই বিচার উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন শুধু ত্যাগ ও মহত্ত্বের পরিচয় দেন নি। তাঁর আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতায়ও সকলে মুগ্ধ হয়েছিল। বিচার শেষে জজ ও এসেসরদের কাছে অরবিন্দের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য তিনি যে অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা অতি অপূর্ব।

তিনি বলেছিলেন—"এই লোকটির বিচার কেবল যে আজ এই বিচারালয়েই চলেছে তা নয়, ইতিহাসের উচ্চ বিচারালয়েও তার বিচার হচ্ছে।

"এই বিচার সম্পর্কে আমাদের তর্ক-বিতর্ক বাদবিতণ্ডা একদিন নীরবতা লাভ করবে, এই কোলাহল থেমে যাবে, এই আন্দোলনের উত্তেজনাও একদিন বিলীন হয়ে যাবে, অরবিন্দও একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন।

"কিন্তু দীর্ঘকাল পরে মানুষ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মহাপুরুষ ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। তাঁর মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরে তাঁর বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে শুধু কেবল ভারতবর্ষে নয়,—সাগরপারে দূর দেশান্তরে।"

অরবিন্দের রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিবরণ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছিল না। তবে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই জেলে অরবিন্দের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁকে জড়াবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তার পাপের ফল সে হাতে হাতেই লাভ করে, জেলেই সে সহকর্মীদের হাতে নিহত হয়। কাজেই তার উক্তি আইন অনুসারে গ্রাহ্য হয় নি।

চিত্তরঞ্জন সরকারী কৌঁসুলির যুক্তির ধূম্রজাল উড়িয়ে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে এ পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ যা করেছেন তা কোনমতেই বে-আইনী নয়। স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা

বেআইনী হতে পারে না। দেশপ্রেম কোন আইন অনুসারেই দোষণীয় হতে পারে না।

জজ বীচ্‌ক্রফ্‌ট ঐ যুক্তিই মেনে নিলেন। সতীর্থের বিচারে অরবিন্দ সম্পূর্ণ নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন। একবছর কারাগারে কাটাবার পর ১৯০৯ সালের ৫ই মে তিনি মুক্তিলাভ করলেন।

অন্যান্য আসামীদের প্রতি কারাবাস, দ্বীপান্তর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের দণ্ডের আদেশ হল। বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। উপেন্দ্রনাথ ও আরো নয়জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল, আর সকলের প্রতি হল পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের আদেশ।

আপীল করা হল বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে। ফাঁসির হুকুম রদ হল—হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

মুক্তির আলোকে

অরবিন্দ মুক্তি পেয়ে বাইরে এলেন। দেশবাসী বিপুল ভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানাল।

চিত্তরঞ্জনের জয়জয়কারেও চারদিক মুখরিত হয়ে উঠল। দেশবাসী চিনল চিত্তরঞ্জনকে। তাঁর সেই ত্যাগ ও মহত্ত্বই বুঝি ভাবী জীবনে তাঁকে দেশবন্ধু খ্যাতিতে মহীয়ান্ করে তোলার পথ প্রশস্ত করে দিল।

আগে থেকেই অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে জানতেন ও চিনতেন। অরবিন্দের জাতীয় আদর্শের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনেরও মতের সামঞ্জস্য ছিল। শুধু এই মতের সামঞ্জস্যই নয়, উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতিও বর্তমান ছিল। অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনের কাব্যগ্রন্থ 'সাগর সংগীতে' ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদ 'Hindu Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অরবিন্দকে চিত্তরঞ্জন যেমন চিনেছিলেন, অরবিন্দও চিত্তরঞ্জনকে ঠিক তেমনি চিনেছিলেন। তাই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে দুঃখ করে অরবিন্দ বলেছিলেন—"তিলকের মৃত্যুর পর একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরই ভারতে স্বরাজ স্থাপনের ক্ষমতা ছিল।"

বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ সম্বন্ধে একদিন যে ভবিষ্যদ্বাণী বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন পরে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য পরিণত হয়েছিল।

অরবিন্দ বাইরে এসে দেখলেন, তিনি যে মহাযজ্ঞের হোমশিখা জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তা প্রায় নিবে এসেছে, রয়েছে মাত্র

তার সামান্য ধূমশিখা। তাঁর দলের জাতীয়তাবাদী নেতারা অনেকেই কারাগারে না হয় দ্বীপান্তরে।

কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বাংলার নয়জন নেতা নির্বাসন ভোগ করছেন। তিলক কারাগারে, বিপিনচন্দ্র বিলেতে এবং অন্যান্য নেতারা কেউ কারাগারে, কেউবা সরে পড়েছেন। ডাঃ মুঞ্জে, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন কোন প্রকারে জাতীয়দলের আদর্শ আঁকড়িয়ে আছেন।

সরকারের প্রচণ্ড দমন-যন্ত্রের নিষ্পেষণে দেশ নিপীড়িত ও সন্ত্রস্ত। ইচ্ছা থাকলেও দেশের লোক দেশসেবায় যোগ দিতে পারছে না। ওদিকে মধ্যপন্থী দলের জয়জয়কার। তাঁরাই আবার রাজনীতিক কর্ণধার হয়ে বসেছেন, কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে তাঁদের করতলগত এবং তাদের নির্দেশেই পরিচালিত।

সংবাদপত্রগুলির অবস্থাও শোচনীয়। তাঁর কারাবাসের সময়ে জাতীয়দলের মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। গবর্নমেন্ট তাঁর প্রেস বাজেয়াপ্ত করেছেন। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি কাগজগুলিও রাজরোষের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

অরবিন্দ নির্বাপিত-প্রায় হোমশিখাকে আবার জ্বালিয়ে তুলে কাজে নেমে পড়তে চেষ্টা করলেন। এবার তাঁর কর্মপদ্ধতি হল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের।

তিনি জেলে যে তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন, যে ঐশীবাণী উপলব্ধি করেছিলেন—দেশকে সেই জ্ঞানের সন্ধান দিতে, সেই বাণী শোনাতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তিনি দেশকে—ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর ইঙ্গিত উপলব্ধি করে তাঁর নির্দেশমত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

এবার তাঁর মূলনীতি হল,—সম্পূর্ণ অহিংসভাবে সংঘর্ষ এড়িয়ে

আবার ভারতে জাতীয় আন্দোলন প্রতিষ্ঠা। এই নীতি প্রচারের জন্য তিনি 'ধর্ম' নামে একখানি বাংলা সংবাদপত্র এবং 'কর্মযোগিন্' নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। এই ছুখানি পত্রিকাই সাপ্তাহিক। এই পত্রিকা ছুখানির সাহায্যে তিনি তাঁর দেশবাসীকে নূতন বাণী শোনাতে লাগলেন। নূতন প্রাণে নূতন আদর্শে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে সকলকে আহ্বান জানালেন।

কারাগার থেকে বের হয়ে অরবিন্দ গীতার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। কারাগারে তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন, যে ঐশীবাণী উপলব্ধি করেছিলেন—দেশকে সেই জ্ঞানের সন্ধান দিতে, সেই বাণী শোনাতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

উত্তরপাড়ায় এক অভিভাষণে অরবিন্দ বললেন—"ভগবান আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করল। আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম।

"আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছ থেকে কি চেয়েছিলেন, যারা তাঁর কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের কাছ থেকে তিনি কি চান। রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে হবে, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে তাঁর জন্য কর্ম করতে হবে, নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হবে।

"কারাগারের সর্বত্র সর্বভূতে আমি বাসুদেবকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমি শুনেছি তাঁর নির্দেশ। ভগবান আমাকে বলেছেন—দেখ, কি সব লোকের মাঝে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি আমার একটু কাজ করবার জন্য। যে জাতকে আমি তুলতে চাই এই হচ্ছে তার স্বরূপ এবং এই কারণেই আমি তাদের তুলতে চাই।

"স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কয়েকবছর আগে বরোদায় থাকার সময়ে আমি ভগবানকে চেয়েছিলাম এবং দেশের কাজের মধ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেই সময়ে যখন আমি ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, তাঁর ওপর যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল তা বলতে পারি না। আমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী, নাস্তিক; ভগবান আদৌ আছেন কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম না। আমি তাঁর বিদ্যমানতা অনুভব করতাম না। তথাপি কি যেন আমাকে বেদের সত্যের দিকে, গীতার সত্যের দিকে, হিন্দুধর্মের সত্যের দিকে আকর্ষণ করত। আমি অনুভব করতাম যে এই যোগের মধ্যে, বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের মধ্যে মহাশক্তিশালী সত্য নিশ্চয়ই আছে।

"তাই আমি যখন যোগের দিকে ফিরলাম, সংকল্প করলাম যে যোগসাধনা করব, দেখব আমার ধারণা সত্য কিনা, তখন আমি এই ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম, ভগবানকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, 'যদি তুমি থাক, তুমি আমার মর্মের কথা জান। তুমি জান, আমি মুক্তি চাই না, অপরে যা চায় এমন কোন জিনিসই আমি চাই না। আমি শুধু চাই, এই যে ভারতের সব মানুষদের আমি ভালবাসি, যেন এদের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি।'

"যোগের সিদ্ধির জন্য আমি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি তা কতকটা লাভ করেছিলাম। কিন্তু যেটি সবচেয়ে বেশী চাইতাম তা পাই নি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নির্জন সেলের মধ্যে, আবার সেটি পেলাম। আমি বললাম, 'দাও আমাকে তোমার আদেশ। আমি জানি না কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন করে করতে হবে। আমাকে একটা বাণী দাও।'
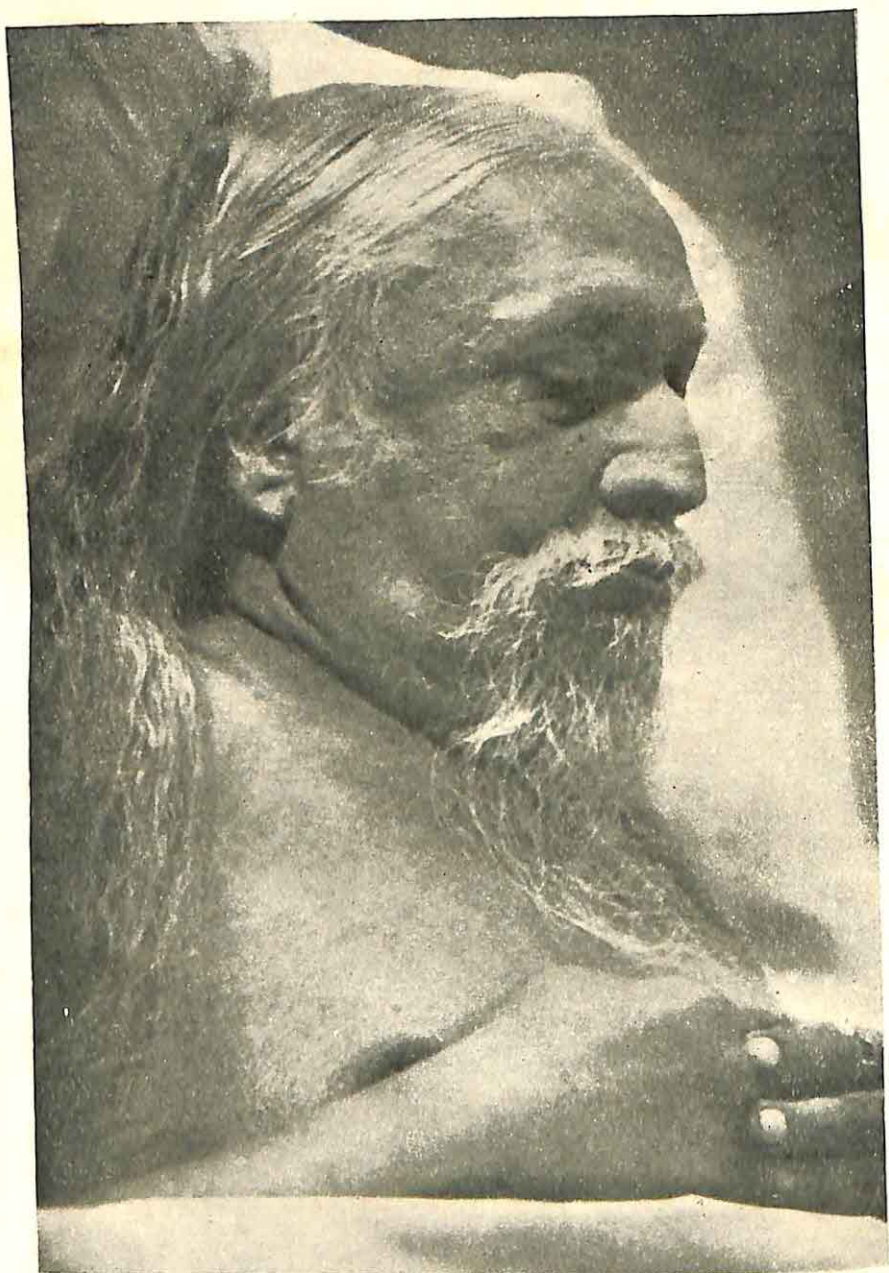
অন্তিম শয়নে ঋষি অরবিন্দ

যোগ-সাধনার ভেতর দিয়ে ছুটি বাণী এল। প্রথম বাণীটি হল, "আমি তোমাকে একটা কাজ দিয়েছি এবং সেটি হচ্ছে এই জাতিকে তুলতে সাহায্য করা। শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন তোমাকে জেলের বাইরে যেতে হবে।"

দ্বিতীয় বাণীটি হল, "এক বছর নির্জনবাসে তোমাকে কিছু দেখান হয়েছে, এমন কিছু যা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা হচ্ছে হিন্দুধর্মের সত্যতা। এই ধর্মটিকে আমি জগতের সামনে তুলে ধরেছি। ঋষি, সন্ত, অবতারদের ভিতর দিয়ে এই ধর্মটিকে আমি সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলেছি। এখন তা যাচ্ছে সব জাতির মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। আমার বাণী প্রচার করবার জন্যই আমি এই জাতিটাকে তুলছি। এইটিই সনাতনধর্ম। তুমি এই ধর্মকে আগে বাস্তবিক পক্ষে জানতে না। কিন্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। তোমার মধ্যে যে অবিশ্বাসী ছিল, নাস্তিক ছিল তার উত্তর দেওয়া হয়েছে, কারণ, আমি তোমাকে প্রমাণ দিয়েছি, অন্তরে ও বাইরে, স্থূলে ও সূক্ষ্মে প্রমাণ দিয়েছি এবং সে প্রমাণে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন-ধর্মের জন্যই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়, সমস্ত জগতের জন্যই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্য...."

কী অমোঘ বাণী। যখন অরবিন্দ এই বাণী পান তখন বোধ হয় জগতের কেউ কল্পনা করতে পারেন নি ভারত অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে।

সেই বাণী পেয়েছিলেন বলেই অরবিন্দ দৃপ্তকণ্ঠে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছিলেন।

'ধর্ম' ও 'কর্মযোগিন্' এই দুটি পত্রিকাই হল অরবিন্দের বাণী প্রচারের বাহন।

আগে 'বন্দে মাতরম্' যেমন জাতিকে প্রেরণা দিত তেমনি এই দুখানি পত্রিকাও জাতির ভেতর প্রচার করতে লাগল 'অভীঃ' মন্ত্র।

'কর্মযোগিন্'-এর প্রচ্ছদপট ছিল—শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত অর্জুনকে কর্তব্য-পালনে প্রবুদ্ধ করছেন। অরবিন্দও প্রেরণা দিতে লাগলেন বিভ্রান্ত, অবসন্ন জাতিকে—সে যেন তমসাচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে। সত্যে বিশ্বাস থাকলে, আকাঙ্ক্ষা অবিচল থাকলে শত বিপত্তিতেও জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

এদিকে ধীরে ধীরে রাজনীতির চাকা ঘুরতে লাগল।

মধ্যপন্থী দল ভারতের রাজনীতির কর্ণধার হয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে 'মর্লি-মিন্টো' শাসন-সংস্কার গ্রহণ করতে ব্যস্ত। এই শাসন-সংস্কারের দ্বারা ভারত কিছু কিছু রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করেছিল সত্য, কিন্তু তার মধ্যে ভারতের যে সর্বনাশের বীজ নিহিত ছিল তা মধ্যপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ, গোখেল প্রমুখ ব্যক্তিরাও তলিয়ে দেখবার শ্রম স্বীকার করলেন না; তাঁরা তার আপাতমধুর চাকচিক্যেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এরপর হিন্দু-মুসলমানের যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঘোর ঘনঘটার সঞ্চার হয়েছে, ঐ 'মর্লি-মিন্টো বিল' অনেকাংশে তার সৃষ্টিকর্তা। ঐ শাসন-সংস্কারে ভারতের শাসন-ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করে, সরকার ভারতের স্বাধীনতা-লাভের পথে এক বিরাট অচলায়তনের সৃষ্টি করলেন।

অরবিন্দের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সংস্কারের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। তিনি দেশবাসীকে তার ভাবী বিষময় ফল বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সংস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে সরকার

যে ভারতের জাতীয় শক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়ার মতলব এঁটেছেন, তা তিনি 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে বিবৃত করতে লাগলেন।

কিন্তু বিভ্রান্ত দেশবাসী।

মধ্যপন্থী দলের কূটনীতিতে জনসাধারণ সঠিক পথ খুঁজে পেল না। ভেদনীতি-বিষাক্ত এই মর্লি-মিন্টো সংস্কারই তারা সাগ্রহে গ্রহণ করে নিল।

ওদিকে এক দুর্যোগের ঘনঘটায় বাংলার আকাশ হয়ে উঠল আচ্ছন্ন।

১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলীতে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন বসবার আয়োজন হল। অভ্যর্থনা সমিতিতে মধ্যপন্থী নেতারা যে সব প্রস্তাবের খসড়া রচনা করলেন তা জাতীয় দলের আদর্শের ঘোর পরিপন্থী। প্রতিনিধি নির্বাচনেও তাঁরা এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে তরুণরা, বিশেষতঃ ছাত্ররা যোগদান করতে না পারে, এমনকি তাঁরা এমনও চক্রান্ত করলেন যাতে অরবিন্দ পর্যন্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে না পারেন।

অরবিন্দ 'ধর্ম' পত্রিকায় তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কারণ তিনি ইতিমধ্যেই ডায়মণ্ডহারবার থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

তবে কেন এ ষড়যন্ত্র? কেন এই গুপ্তনীতি?

অরবিন্দ নানা প্রস্তাব সংবলিত প্রচারপত্র নিজের প্রেসে মুদ্রিত করলেন। একুশ বছর বয়সের গণ্ডি উঠিয়ে দিয়ে তিনি ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালেন।

তিনি হুগলীর জাতীয় দলকে নির্দেশ দিলেন ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হোক। অভ্যর্থনা-সমিতি আগেই এ ব্যাপারে যে নিষেধ করেছেন, তা যেন কিছুতেই মেনে নেওয়া না হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতি যে সব প্রস্তাব উত্থাপিত হবে বলে প্রচার করেছিল, অরবিন্দ প্রতি প্রস্তাবের পাশে জাতীয় দলের প্রস্তাব লিখে আবার তা ছাপিয়ে জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তারপর সেই প্রচারপত্র সহ জাতীয় দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি সম্মেলনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

অরবিন্দ যে এমন সাহসের সঙ্গে এ পথে অবতীর্ণ হবেন তা মধ্যপন্থী নেতারা ভাবতে পারেন নি। কাজেই অরবিন্দকে দেখে তাঁরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

সবাই ভাবলেন, আবার এক কুরুক্ষেত্রের সূচনা হবে!

কিন্তু সেদিন ভগবানের আশীর্বাদ ছিল অরবিন্দের ওপর। প্রচারপত্র বিলি হওয়ার পর সম্মেলনের আবহাওয়া যেন ঘুরে যেতে লাগল। প্রতিনিধিরা অরবিন্দের প্রস্তাবই সমীচীন বলে গ্রহণ করলেন।

মধ্যপন্থী দল নানারূপ কৌশল অবলম্বন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জনতার ধিক্কার ধ্বনিতে তাঁদের নিরস্ত হতে হল।

মধ্যপন্থীদের সমস্ত চেষ্টা গেল ব্যর্থ হয়ে।

অরবিন্দ দেশকে আবার সঙ্ঘবদ্ধ করে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য বাংলার নানাস্থানে ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতায় ভগবদ্‌ভক্তির কথাই মূর্ত হয়ে উঠত। তাঁর প্রত্যেকটি কাজ তিনি ভগবানের নির্দেশ বলেই মনে করেন। জনসাধারণকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় সেই কথাই জানিয়ে দিতে লাগলেন।

অরবিন্দ প্রচার করতে লাগলেন বৃহত্তর ভারতের বাণী। বিশ্ব-মানবের কল্যাণের জন্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এই মহান্ আদর্শকে ভারতের জাতীয় জীবন-পরিকল্পনায় স্থান দিলেন। তাঁর শিক্ষা উদার, মন উদার; এতটুকু সংকীর্ণতা তাঁর কোথাও নেই।

অরবিন্দ বললেন, ভারতের মুক্তি চাই; কিন্তু সে মুক্তির উদ্দেশ্য হবে বিশ্বের কল্যাণসাধন,—ভারতের স্বার্থসিদ্ধি নয়। ভারতের যে স্বাধীনতার আন্দোলন, তার স্রষ্টা স্বয়ং ভগবান্। সনাতন ভারতীয় ধর্মকে জগতে প্রচারের জন্যই ভারতের মুক্তি আবশ্যক। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এই যে চারদিকে নানা বাধা, নানা নিপীড়ন চলছে, তাও সেই মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা। এতে মানুষের কোন হাত নেই। ভারতের মুক্তি ঘটবেই, বিধাতার সে-বিধান মানুষ হাজার চেষ্টা করেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

বরিশালের ঝালকাঠিতে বক্তৃতায় অরবিন্দ বলেন—"সরকারের দমননীতি দেশের মঙ্গলের জন্যই। এই আন্দোলনের নেতা স্বয়ং ভগবান্। অশ্বিনীকুমার দত্তও এই আন্দোলনের নেতা নন বা তিলকও এই আন্দোলনের নেতা নন। রাজরোষের যে ঝঞ্ঝা আজ দেশের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে, তার সৃষ্টি রাজপুরুষরা করেন নি। সেটাও ভগবানের দান। এতে বিচলিত হলে চলবে না। নীরবে ধৈর্য সহকারে উজ্জ্বল প্রভাতের প্রতীক্ষায় একে সহ্য করে থাকতে হবে। সহ্য করবার শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে।

"আমাদের স্বরাজলাভের উদ্দেশ্য—আমাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, ধর্মকে পাবার জন্য। স্বরাজ বলতে এই বুঝায় না যে, দেশবাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, দেশময় সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করবে, বা বোমা রিভলবারে দেশ আচ্ছন্ন করে দেবে। স্বরাজ অর্থ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা অন্য কোনপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণতা লাভই স্বরাজের আদর্শ। হিংসার পন্থা এই স্বরাজের পথ নয়। শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা—সব রকম জাতীয় অনুষ্ঠানেই আমাদের

স্বদেশী মন্ত্র গ্রহণ করে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখতে হবে। প্রত্যেক জাতি তার ন্যায্য অধিকার লাভ করবেই—এটা বিধাতার বিধান। কোনও রাজশক্তির সাধ্য নেই সে বিধানে বাধা দেয়। নির্যাতন আসবেই, কিন্তু আত্ম-শক্তিতে আস্থাবান হয়ে সেই নির্যাতনে টিকে থাকবার মত শক্তি অর্জন করতে হবে।

অরবিন্দ দেশময় ঘুরে ঘুরে বুঝতে পারলেন সারা দেশ এক গভীর অবসাদে ছেয়ে গেছে।

একদিকে বিপ্লবের বিষাণ অপরদিকে দমননীতির বিভীষিকা।

এসময়ে কে শুনবে অরবিন্দের বাণী—কে শুনবে তাঁর আধ্যাত্মিক উপদেশ ?

অরবিন্দ বুঝতে পারলেন তাঁর বাণী শোনবার মত জাতির অবস্থা এখন নয়। তিনি যেন অন্তর থেকে আদেশ শুনতে পেলেন—কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে গভীর সাধনার জন্য যাও সুদূরে—নিজকে তৈরি কর।

কিন্তু এই কি শুধু ভগবানের নির্দেশ? কি হবে জাতির ভবিষ্যৎ!

অরবিন্দ স্থির করলেন পূর্ণ যোগমার্গ অবলম্বন করে সাধনার দ্বারা ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ করতে হবে। সেই নির্দেশ চাই ভগবানের কাছ থেকে।

রাজনীতি ছেড়ে আশ্রম-জীবনে প্রবেশ করবার সংকল্প করলেন অরবিন্দ।

অনেকে মনে করেন যে অরবিন্দ রাজনীতির ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে না পেরে বাংলা ত্যাগ করবার সংকল্প করলেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, সমস্ত জীবনে তিনি কিরূপে স্বেচ্ছায় বারবার দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা ভুলে যান যে, কারাগারের অসহ্য ক্লেশ তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার

দুঃখকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি যে আবার রাজরোষের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তা 'ধর্ম' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটি পড়লেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

"আমাদের পুলিস বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে। এইবার নয় জন নহে, চব্বিশ জনকে—মোটরকারে, রেলে, Guide জাহাজে গবর্ণমেন্টের খরচে নানা প্রদেশ ও বিবিধ জেলে ঘুরিয়া আসিবার জন্য প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিসের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন।

"আমরা কখনও বুঝিতে পারি নাই নির্বাসন এমন কি ভয়ংকর জিনিস যে, লোকে নির্বাসনের নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য, কর্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগপূর্বক কম্পিতকলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িবে। চিদাম্বরম্ প্রভৃতি কর্মবীর বয়কট প্রচার অপরাধে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে শিরোধার্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই লঘু দণ্ড অতি অকিঞ্চিৎকর।

"বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবা করিতেছিলাম ; না হয় ভগবান লর্ড মিন্টো ও মর্লিকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জনে আমার চিন্তা কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে, নির্জনতার রস আস্বাদন কর।

ইহা এমন কি কথা যে ভয়ে কাতর হইতে হয়? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পাইব না—বিলাতে বেড়াইতে গেলেও তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন অখাদ্য খাইয়া গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বাড়িতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই ; বাড়িতেও অসুখ হয়,

মরণ হয়; অদৃষ্ট-লিখিত আয়ুঃক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর পক্ষে মরণের ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরাতন বস্ত্র গেল, আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপনা করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব; কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইতিহাসে অমর নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত অথচ কষ্ট নাই, অথচ সামান্য শরীর-ক্লেশে মুক্তি ভুক্তি পাইলাম। এই তো কথা! ট্রান্সভালের কুলীদের মহৎ ভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতর ভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।"

ঐ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অধিকার লাভ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। ঐ ঘটনাও অরবিন্দের মনকে আন্দোলিত করছিল। 'ধর্ম' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে তিনি আরও আলোচনা করেছিলেন।

যা হোক, ভারতের স্বাধীনতালাভের ব্যাপারে অরবিন্দ ছিলেন অখণ্ড বিশ্বাসী। তাই নির্ভয়ে 'ধর্ম' পত্রিকায় লিখেছিলেন—

"চব্বিশ জনকে নির্বাসন করুন বা একশ জনকে নির্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসন করুন বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে নির্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামবার নয়।"

কাজেই অরবিন্দ যে রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে যোগমার্গে চলে গেলেন, তার কারণ পার্থিব কিছু নয়।

১৯১০ সালের মার্চ মাসে অরবিন্দ কলকাতা থেকে চন্দননগর যাত্রা করেন। সেখান থেকে তিনি বিজয়কুমার নাগ ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে পণ্ডিচেরী চলে যান।

৪ঠা এপ্রিল তারিখে অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বরোদা থেকে বাংলায় ছুটে এসেছিলেন,

এভাবে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেই আবার তিনি বাংলার বাইরে এসে ভিন্ন কর্মস্থানে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কর্মধারা নির্ধারণ করে নিলেন।

পণ্ডিচেরীতে গিয়ে অরবিন্দ তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমারকে এক পত্র লিখলেন—পণ্ডিচেরী আমার যোগসিদ্ধির নির্দিষ্ট স্থল, অবশ্য এক অঙ্গ ছাড়া, সেটা হচ্ছে কর্ম। আমার কর্মের কেন্দ্র বঙ্গদেশ, যদিও আশা করি তার পরিধি হবে সমস্ত ভারতবর্ষ ও সমস্ত পৃথিবী।

যোগসাধনায়

নির্জন সমুদ্রতীরে পণ্ডিচেরীতে গড়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম।

পূর্বজীবনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, একান্ত নির্জনতায় হল তাঁর নবজীবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা। প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বিজয়কুমার নাগ। কয়েকমাস পরে নলিনীকান্ত গুপ্ত এসে যোগ দিলেন। তারও কিছুদিন পরে এলেন সৌরীন্দ্রনাথ বসু।

বহু বাধা, বহু বিঘ্নের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আশ্রমটি গড়ে উঠতে লাগল। আশ্রম গঠনের প্রাথমিক এবং সকলের চেয়ে বড় বাধা ছিল দুটি—টাকার অভাব এবং গোয়েন্দার সদা-সতর্ক দৃষ্টি।

পুলিস সেখানে অরবিন্দের প্রত্যেকটি কাজের ওপর প্রখর নজর রাখতে লাগল। তারা মনে করল ব্রিটিশ শাসনের বাইরে ফরাসী রাজ্যে থেকে গোপনে গোপনে বিপ্লব-আন্দোলন চালানো সুবিধা হবে বলেই অরবিন্দ বুঝি সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

অরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে গমনের কিছুদিন পরেই সরকারবাহাদুর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের লেখা একটি ইংরেজী প্রবন্ধে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে তাঁর নামে মামলা দায়ের করলেন।

মনোমোহন ঘোষ ছিলেন পত্রিকাটির মুদ্রাকর। অরবিন্দের পরিবর্তে তাঁকেই ধরা হল। নিম্ন আদালতের বিচারে মনোমোহন ঘোষ ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এ ব্যাপারে হাইকোর্টে আপীল করা হল। সেখানে প্রতিপন্ন হল প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক নয়। মনোমোহন ঘোষ মুক্তি পেলেন।

আশ্রম তৈরি এবং পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অথচ অরবিন্দ বা আশ্রমের অপর কেউ কোনদিন কারুর কাছে অর্থ সাহায্য চান নি। আশ্চর্যের বিষয়, আশ্রম গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অযাচিত ভাবে অর্থ সাহায্য আসতে লাগল। একজন দু'জন করে তাঁর ভক্ত শিষ্য তাঁর পাশে এসে সমবেত হতে লাগলেন। আশ্রমটি দিন দিন নূতন শ্রী ও নূতন শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

অরবিন্দ কখনও কাউকে আশ্রমবাসী হবার জন্য ডেকে আনেন নি। সকলেই স্বেচ্ছায়, দৈব-প্রেরণায় ও তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এসে তাঁর কাছে সমবেত হতে লাগলেন। ক্রমে আশ্রমের জনসংখ্যা এরূপ বেড়ে গেল যে, তাঁদের থাকবার জন্য আরও ঘরের ব্যবস্থা করতে হল। বাড়িগুলির স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আশ্রমবাসীদের উপযুক্ত খাদ্যসরবরাহ—দিনে দিনে গুরুতর দায়িত্ব এসে পড়তে লাগল আশ্রমের ওপর। অথচ সবই নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হতে লাগল। যেন ভগবান্‌ই অন্তরালে থেকে সব কিছু পরিচালনা করতে লাগলেন।

দক্ষিণ ভারতের জাতীয় দলের কয়েকজন নেতা তখন পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন। তাঁরা অরবিন্দকে পেয়ে খুশী হলেন। তাঁরা ভাবলেন, অরবিন্দ এখান থেকেই রাজনীতিক আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করবেন। কিন্তু অরবিন্দ পেয়েছেন মহত্তর আহ্বান—কাজেই নেতাদের এই আহ্বানে ও ইচ্ছায় তিনি সাড়া দিতে পারলেন না।

ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস থেকে বার বার আহ্বান আসতে লাগল। বহু নেতা পণ্ডিচেরী গিয়ে তাঁকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। লোকমান্য তিলক নিজে গেলেন অরবিন্দের কাছে। তাঁকে অনুরোধ করলেন বাংলার

যোগসাধনায়

নির্জন সমুদ্রতীরে পণ্ডিচেরীতে গড়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম।

পূর্বজীবনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল, একান্ত নির্জনতায় হল তাঁর নবজীবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা। প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও বিজয়কুমার নাগ। কয়েকমাস পরে নলিনীকান্ত গুপ্ত এসে যোগ দিলেন। তারও কিছুদিন পরে এলেন সৌরীন্দ্রনাথ বসু।

বহু বাধা, বহু বিঘ্নের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আশ্রমটি গড়ে উঠতে লাগল। আশ্রম গঠনের প্রাথমিক এবং সকলের চেয়ে বড় বাধা ছিল দুটি—টাকার অভাব এবং গোয়েন্দার সদা-সতর্ক দৃষ্টি।

পুলিস সেখানে অরবিন্দের প্রত্যেকটি কাজের ওপর প্রখর নজর রাখতে লাগল। তারা মনে করল ব্রিটিশ শাসনের বাইরে ফরাসী রাজ্যে থেকে গোপনে গোপনে বিপ্লব-আন্দোলন চালানো সুবিধা হবে বলেই অরবিন্দ বুঝি সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

অরবিন্দের পণ্ডিচেরীতে গমনের কিছুদিন পরেই সরকারবাহাদুর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের লেখা একটি ইংরেজী প্রবন্ধে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে তাঁর নামে মামলা দায়ের করলেন।

মনোমোহন ঘোষ ছিলেন পত্রিকাটির মুদ্রাকর। অরবিন্দের পরিবর্তে তাঁকেই ধরা হল। নিম্ন আদালতের বিচারে মনোমোহন ঘোষ ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এ ব্যাপারে হাইকোর্টে আপীল করা হল। সেখানে প্রতিপন্ন হল প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক নয়। মনোমোহন ঘোষ মুক্তি পেলেন।

আশ্রম তৈরি এবং পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অথচ অরবিন্দ বা আশ্রমের অপর কেউ কোনদিন কারুর কাছে অর্থ সাহায্য চান নি। আশ্চর্যের বিষয়, আশ্রম গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অযাচিত ভাবে অর্থ সাহায্য আসতে লাগল। একজন দু'জন করে তাঁর ভক্ত শিষ্য তাঁর পাশে এসে সমবেত হতে লাগলেন। আশ্রমটি দিন দিন নূতন শ্রী ও নূতন শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

অরবিন্দ কখনও কাউকে আশ্রমবাসী হবার জন্য ডেকে আনেন নি। সকলেই স্বেচ্ছায়, দৈব-প্রেরণায় ও তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এসে তাঁর কাছে সমবেত হতে লাগলেন। ক্রমে আশ্রমের জনসংখ্যা এরূপ বেড়ে গেল যে, তাঁদের থাকবার জন্য আরও ঘরের ব্যবস্থা করতে হল। বাড়িগুলির স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আশ্রমবাসীদের উপযুক্ত খাদ্যসরবরাহ—দিনে দিনে গুরুতর দায়িত্ব এসে পড়তে লাগল আশ্রমের ওপর। অথচ সবই নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হতে লাগল। যেন ভগবান্‌ই অন্তরালে থেকে সব কিছু পরিচালনা করতে লাগলেন।

দক্ষিণ ভারতের জাতীয় দলের কয়েকজন নেতা তখন পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছানির্বাসনে ছিলেন। তাঁরা অরবিন্দকে পেয়ে খুশী হলেন। তাঁরা ভাবলেন, অরবিন্দ এখান থেকেই রাজনীতিক আন্দোলনে প্রাণসঞ্চার করবেন। কিন্তু অরবিন্দ পেয়েছেন মহত্তর আহ্বান—কাজেই নেতাদের এই আহ্বানে ও ইচ্ছায় তিনি সাড়া দিতে পারলেন না।

ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস থেকে বার বার আহ্বান আসতে লাগল। বহু নেতা পণ্ডিচেরী গিয়ে তাঁকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। লোকমান্য তিলক নিজে গেলেন অরবিন্দের কাছে। তাঁকে অনুরোধ করলেন বাংলার

কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার জন্য। কংগ্রেস তাঁকে সভাপতি নির্বাচিত করে শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করল। কিন্তু কোন কিছুই অরবিন্দকে সংকল্পচ্যুত করতে পারল না।

কালক্রমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গীদেরও কারাজীবন শেষ হল। তাঁরা আকুল আগ্রহে গেলেন অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু গিয়ে বুঝলেন তাঁকে কিছুতেই আগেকার জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। অনেকে কয়েকদিন অরবিন্দের সংস্পর্শে এসেই যে নূতন আদর্শময় জীবনের সন্ধান পেলেন—তাতে তাঁরাও রয়ে গেলেন সেই আশ্রমে।

ধীরে ধীরে অরবিন্দের আশ্রম—ঋষি অরবিন্দের যোগস্থান—ভারতের এক পুণ্য ক্ষেত্রে পরিণত হল। ধর্মপিপাসু, তত্ত্বান্বেষী বহু দেশীয় এবং বিদেশীয় নরনারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সভাপতি পরলোকগত উড্রো উইলসনের কন্যা এই আশ্রমবাসিনী হলেন। এই আশ্রম থেকে কী এক অপূর্ব সত্য-লাভের আশায় যেন সমস্ত জগৎ সতৃষ্ণনয়নে এর দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অরবিন্দ ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরীতে গমন করেন। তিন চার বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ তাঁর বিশেষ কোন সংবাদ পায় নি। ১৯১৪ সালের ১৫ই আগস্ট পণ্ডিচেরী থেকে অরবিন্দের সম্পাদনায় 'আর্য' নামক ইংরেজী দার্শনিক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের রচনা পাঠ করে লোকে তাঁর চিন্তাধারা, মনোভাব, উদ্দেশ্য প্রভৃতির পরিচয় পেতে আরম্ভ করে। ১৯২১ সাল পর্যন্ত 'আর্য' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তিনি আরও গভীরভাবে যোগসাধনায় মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্যে 'আর্যের' সম্পাদনাভার ত্যাগ করেন।

পণ্ডিচেরী আশ্রমের বিশেষ একজনের কথা না বললে ঋষি অরবিন্দের জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন শ্রীমা!

শ্রীমা একজন বিদুষী ফরাসী মহিলা। তাঁর নাম মীরা রিচার্ড। বিচিত্র তাঁর জীবন।

১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্যারিস শহরে মীরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সেখানকার একজন ধনী ব্যাঙ্ক-মালিক। মঁসিয়ে পল রিচার্ডের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ছোটবেলা থেকেই মীরা ছিলেন আধ্যাত্মিক মনোভাবসম্পন্ন। নিবিড় সান্নিধ্যের জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, মঁসিয়ে পলের মনেও ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠতে থাকে।

সংসারে আর মন বসল না তাঁদের। মীরা ও মঁসিয়ে পল রিচার্ড আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরতে লাগলেন। ১৯১৪ সালের ২৯শে মার্চ তাঁরা এসে পৌঁছলেন পণ্ডিচেরীতে। সেখানে এসে প্রথম দর্শনলাভ করলেন শ্রীঅরবিন্দের। দেখেই তাঁরা মুগ্ধ হলেন।

শ্রীঅরবিন্দকে দেখে প্রথম দিনেই মীরা রিচার্ডের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সে-কথা পরের দিনই তিনি তাঁর প্রার্থনার মধ্যে লিখেছিলেন—

"হে পরম প্রভু, তুমিই এই পরম আশ্চর্যের বিরাট স্রষ্টা। এই কথাটি স্মরণ করেই আমার হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ছাপিয়ে উঠেছে, আমার অন্তরের আশা সীমা অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের ভক্তি সমস্ত বাক্যসীমাকে ছাড়িয়ে গেল, আর কোন কিছু না বলেই নিঃশব্দে আমি তোমার কাছে শুধু আমার প্রণাম জানাই।"

এর পরে দু-চার দিনের মধ্যেই তিনি আরো ভালো করে

সব কিছু বুঝলেন, শ্রীঅরবিন্দকেও বুঝলেন আর নিজেকেও বুঝলেন। কয়েকদিন পরেই তিনি আবার লিখলেন—

"আমার হৃদয়ে ভরে উঠল এক বিপুল কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য। আমি এখন বুঝতে পারছি যে এতকাল ধরে আমি যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এবার তারই দ্বারদেশে এসে পৌঁছে গেছি।"

এর পর মীরা রিচার্ড শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় দীক্ষিতা হলেন এবং পণ্ডিচেরীতে থাকাই মনস্থ করলেন। গ্রহণ করলেন আশ্রম-জীবন। উনি এবং ওঁর স্বামী দুজনেই শ্রীঅরবিন্দের কাজের ভার গ্রহণ করলেন। এঁদের সহযোগিতা নিয়েই শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ করলেন 'আর্য' পত্রিকা।

'আর্য' পত্রিকা শুধু ইংরেজীতেই নয়, ফরাসী ভাষাতেও প্রকাশিত হতে লাগল। শ্রীমা ও পল রিচার্ড দু'জনেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকা সম্পাদনায় শ্রীঅরবিন্দকে সাহায্য করবার ভার নিলেন। কিছুকাল পত্রিকা দুটি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে লাগল।

পল রিচার্ড নিজে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ভারতীয় দর্শন গভীর আগ্রহে পাঠ করেছেন। শ্রীমা ফরাসী মহিলা হলেও তিনি ইংরেজীতে বিশেষ সুপণ্ডিত এবং অসীম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারিণী। 'আর্য' পত্রিকায় তাঁর বহু ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সব প্রবন্ধে লেখিকা হিসাবে তাঁর নাম থাকত না।

কিন্তু সহসা শ্রীমায়ের আশ্রম-জীবন যাপনের পথে উপস্থিত হল এক বিরাট বাধা।

কিছুদিন পরেই ইওরোপে মহাসমর বেঁধে উঠল। এক বছর মাত্র পণ্ডিচেরীতে থাকার পর শ্রীমা আর পল রিচার্ড ফ্রান্সে ফিরে

যেতে বাধ্য হলেন। মঁসিয়ে পল যুদ্ধের বাধ্যতামূলক আইনে সৈন্যদলভুক্ত হলেন।

শ্রীমায়ের তখনকার মনের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তখনও ভালো করে কাজের ক্ষেত্র তৈরী হয় নি, তাঁর মনের মতো কাজগুলি করা শুরুই হয় নি, কিন্তু তবুও সব কিছু ছেড়ে হঠাৎ চলে যেতে হলো।

যাবার সময় জাহাজে বসে তিনি লিখলেন—"নিঃসঙ্গতা, অতি তীব্র রকমের এই নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা, যেন অন্ধকারে এক নরককুণ্ডের মধ্যে কেউ আমাকে হঠাৎ ঘাড়ে ধরে ঠেলে ফেলে দিলে।.... হে প্রভু, কী দোষ করলাম যে এই দুর্ভেদ্য রাত্রির ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমাকে এমন করে নিক্ষেপ করলে?"

স্বদেশে ফিরে গিয়ে তাঁর করবার মত কাজ আর কিছুই রইল না। এই সময়টি ছিল মায়ের জীবনে সবচেয়ে বেশী দুঃসময়। যারা কাজের লোক এবং বিশেষ একটি মহৎ কাজকে জীবনের ব্রত করেছে তাদের পক্ষে কাজ হারিয়ে বসে থাকা বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার।

প্যারিসে মন অস্থির হয়ে উঠল। এক বছরের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন জাপানে। সেখানে গিয়ে প্রার্থনায় বসে একদিন লিখলেন—"হে প্রভু, তোমার যে নিস্তরঙ্গ নিথর স্থিরতা আমার অন্তরের মধ্যে এনে দিলে, তাতে আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের গণ্ডিটুকু একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল। এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমি রয়েছি সব-কিছুরই মধ্যে, আর তার চেয়ে আরো স্পষ্ট করে দেখছি যে সব-কিছুই রয়েছে এই আমার মধ্যে। কিন্তু মন আমার এই দিব্য আনন্দের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজেকে সমুচিতভাবে প্রকাশ করবার কোন আর শক্তিই খুঁজে পায় না।"

পণ্ডিচেরী থেকে চলে যাবার প্রায় পাঁচ বছর পরে আবার

তিনি স্বামীর সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে ফিরে এলেন ১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে। মঁসিয়ে পল রিচার্ড কিছুদিন আশ্রমে থেকে দেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু শ্রীমা রয়ে গেলেন এখানেই। তখন থেকেই তিনি হলেন স্থায়ী আশ্রমবাসিনী।

তখন থেকেই মা আশ্রমের সব কিছুর ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাতে প্রথম প্রথম অনেক বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছাড়া অনেক রকম অসুবিধার ভেতর দিয়েও কিছুকাল অতিক্রম করতে হয়েছিল, কিন্তু মা সে-সব কষ্ট হাসিমুখেই সহ্য করলেন। মনের মতো কাজ পেয়ে এবং কাজের ক্ষেত্র পেয়ে তিনি তৃপ্তি বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু এর পর থেকে তাঁর ডায়েরি বা প্রার্থনা লেখা ফুরিয়ে গেল। রীতিমতভাবে কর্মসাগরে ডুবে গেলেন তিনি।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স থেকে মা পণ্ডিচেরীর আশ্রমে স্থায়িভাবে বাস করতে লাগলেন। তখন আশ্রম বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। একটিমাত্র বাড়িতে থাকতেন শ্রীঅরবিন্দ, তারই উপরতলার একটি ঘরে মায়ের থাকবার স্থান হলো। মাত্র আট-দশজন সহচরদের নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ সেখানে তাঁর সাধনা করতেন ও লেখাপড়ার কাজ করতেন।

আশ্রমের অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই তেমন যত্ন হয় না। দেখবার শোনবার মত বিশেষ কেউ নেই।

মা সেখানে থেকে প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনা শুরু করলেন। সব সময়ে তিনি নিজের ঘরের মধ্যেই থাকেন, কেবল দুবেলা খাবার সময়টিতে আর বিকেলে যখন সকলে শ্রীঅরবিন্দের কাছে বসে কথাবার্তা বলেন, সেই সময়টিতে তাঁকে দেখা যায়।

শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে সকলে বসেন চেয়ারে, কিন্তু ইনি বসেন

শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে, মাটির ওপর একটি আসন পেতে। পরনে তাঁর দেশী শাড়ি ও ব্লাউজ। এ দেশীয় পোশাকে অভ্যস্ত না হলেও তিনি নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। শোনা যায় অনেককাল পরে শ্রীঅরবিন্দ যখন তাঁকে আদেশ করেছিলেন তখন শ্রীমা আবার ইওরোপীয় পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন। আশ্রমের সকলেই খেতেন মাছ-মাংস, এমন কি শ্রীঅরবিন্দ নিজেও তাই খেতেন। কিন্তু শ্রীমা খেতেন নিরামিষ—এখনও তাই খেয়ে আসছেন।

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। ঐদিন থেকে আশ্রমের সব কিছু ভার মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বাইরের জগতের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করে তাঁর নিদিষ্ট ঘরটিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে রইলেন। ঐদিন থেকেই মা হলেন আশ্রমের শ্রীমা।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেবার পর মাকে প্রথম প্রথম নানারকম অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। আশ্রমের লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেল, স্থান সংকুলান আর হয় না। বিব্রত হয়ে পড়লেন শ্রীমা।

কিন্তু ভগবানই বুঝি সংকটের সমাধান করে দিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে শ্রীমা লাভ করলেন প্রচুর অর্থ। সেই অর্থ দিয়ে আশেপাশে কিছু কিছু বাড়ি কিনে তিনি আশ্রমটিকে ক্রমে ক্রমে অনেকখানি বাড়িয়ে ফেললেন। তাছাড়া আরো নানাভাবে আশ্রমে অর্থ এসে পড়তে লাগল। তখন শ্রীঅরবিন্দ এই নিয়ম করে দিলেন, যে আশ্রমে এসে বাস করবে সে তার সব কিছুই মাকে সমর্পণ করে দেবে, তা সামান্যই হোক আর প্রচুরই হোক, আর মা তার ভরণপোষণ সব কিছুর ভার নিয়ে নেবেন।

এইভাবে মা ক্রমে ক্রমে বেশ বড়ো করে গড়ে তুললেন শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম।

শ্রীমা এই আশ্রমটিকে শুধু যোগসাধনার আশ্রম নয়—কর্ম-সাধনার আশ্রমরূপেও গড়ে তুলতে চাইলেন। তিনি বললেন—এই আশ্রমে বসে শুধু ধ্যান করলেই চলবে না, অন্য কাজও কিছু কিছু করতে হবে। সে কাজ বাইরের কাজ নয়, এই আশ্রমেরই পরিচালনার কাজ। এই আশ্রমটিকে সকলে মিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে। কেবল জ্ঞানযোগই যোগ নয়, কর্মযোগও যোগ।

এর জন্যে তিনি আশ্রমে কয়েকটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে দিলেন; যেমন, খাদ্যবিভাগ, শিল্পবিভাগ, কৃষিবিভাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক বিভাগের কর্মীদের কাজ করতে হবে তাঁরই নির্দেশ অনুসারে।

শ্রীঅরবিন্দও নির্দেশ দিলেন যে মা যাকে যেমন আদেশ করবেন সেই অনুসারে প্রত্যেককে চলতে হবে।

এতে কেউ কেউ বিরূপ হয়ে উঠল। এভাবে একজন বিদেশিনী মহিলাকে সর্বেসর্বা বলে স্বীকার করে নিতে অনেকেই রাজী হলেন না। কিন্তু মায়ের ধৈর্য অসাধারণ, গুণও তাঁর অসাধারণ। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর দৈবীশক্তির জোরে সকলকেই বশ করলেন। আশ্রমের সব কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে লাগল।

এরপর মা আশ্রমে আবার এক নতুন রকমের নিয়ম করলেন। তিনি আশ্রমবাসীদের শরীরচর্চার দিকে ঝোঁক দিলেন। বললেন, কাজ করা ছাড়াও সকলকেই কিছু না কিছু নিজের পছন্দমতো ব্যায়াম করতে হবে।

তিনি এই নিয়ম করার যথেষ্ট কারণ দেখালেন। তিনি বললেন, মানুষের জগতে এখনো এমন দিন আসে নি যখন আনন্দে থাকা ও স্বাস্থ্যবান থাকা সকলের পক্ষে আপনা থেকেই স্বাভাবিক হবে,

দুঃখ ও অসুস্থতা আপনা থেকেই তফাত হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই ঐগুলিকে তফাতে রাখবার জন্য আমাদের নিত্যই সাবধান থাকা দরকার। যাতে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখা যায় তার বাস্তব চেষ্টা করা দরকার। শরীরচর্চা দোষের নয়, এটা সাধারণ মানুষের পক্ষেও দরকারী, একজন যোগীর পক্ষেও দরকারী। শরীর-সাধনা যোগেরই একটা অঙ্গ।

শ্রীঅরবিন্দ মুক্তকণ্ঠেই এতে সায় দিলেন। তিনি বললেন, আমরা তো কুস্তিগীর পালোয়ান বা কসরতগীর ভীমভবানী হওয়া চাইছি না, আমরা চাইছি যে, সুস্থ ও সাবলীল করে আপন আপন দেহকে গড়ে তোলো।

অনেকেই খুশীমনে এটা মেনে নিলে, কিন্তু কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তবে শেষ পর্যন্ত মা সকলকেই জয় করলেন।

শ্রীমায়ের কার্যকুশলতার গুণে সেই আশ্রম একটি ছোটোখাটো শহরের মত এক বিরাট আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল। প্রায় দেড়হাজার লোক সেখানকার প্রায় দুশোখানা বাড়িতে বাস করতে লাগল। তাছাড়া সাতশোজন শ্রমিক রইল সেখানে নানা বিভাগে নিত্য কাজে নিযুক্ত। 'গোলকুণ্ডা' নামে এক অপূর্ব আধুনিক ধরনের বৃহৎ অট্টালিকা তৈরী হল, যার তুলনা নাকি সমগ্র এশিয়ার মধ্যে আর কোথাও নেই। বহুসংখ্যক অতিথি অভ্যাগতের জন্য সেখানে সুব্যবস্থা করা হল। সেখানকার নতুন ধরনের ইট, কাঠ, সরঞ্জাম প্রভৃতি সব কিছুই আশ্রমে তৈরী। প্রত্যেকটি ফার্নিচার তৈরী হয়েছে ঐ আশ্রমেই আর সব কিছুই হয়েছে মায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী। নতুন কোন অতিথি আসামাত্র তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রত্যেক জিনিসেরই মর্যাদা আছে, সেই বুঝে এখানকার প্রত্যেক জিনিসটিকেই যেন যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

আশ্রমে যারা থাকে তারা সকলেই নিশ্চিন্ত ও সুখী। নিজেদের খাবার পরবার ভাবনা কাউকেই ভাবতে হয় না। সব কিছু ভাবনা মায়ের, সব কিছু ভার মায়ের। তবে তার বিনিময়ে সকলকেই কিছু-না-কিছু কাজ করতে হয়। স্ত্রী-পুরুষে কোন প্রভেদ নেই, পরিচিত বা অপরিচিত স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে মিলে সবাই আপন মনে কাজ করে যায়। ছোট কাজ ও বড়ো কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সব কাজই সমান, যাকে মা যে কাজের ভার দেবেন সে অম্লানবদনে তাই করবে। ঝাঁট দিতে, বাসন মাজতেও কারো দ্বিধা করলে চলবে না। পদমর্যাদা বা আত্মাভিমানের কোন প্রশ্নই সেখানে ওঠে না।

বাড়ি তৈরি ও বাড়ি মেরামতের জন্য আছে এক স্বতন্ত্র পূর্ত-বিভাগ। তাছাড়া আছে পৌর স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ, জল সরবরাহ বিভাগ, ইলেকট্রিক বিভাগ, আর আছে দরজা জানালা ও ফার্নিচার প্রভৃতি প্রস্তুতের বিভাগ।

খাদ্য উৎপাদনের জন্য রয়েছে কৃষিবিভাগ। আশ্রমের জমিতে যথেষ্ট ধান উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ফলমূল ও সবজির বাগান আছে। সেখানে তরিতরকারি যা উৎপন্ন হয় তাতেই প্রায় সারা বছর চলে যায়। নারকেল ও কলা উৎপন্ন হয় প্রচুর।

তারপরে আছে প্রকাণ্ড ডেয়ারী বা গোশালা। পশ্চিম দেশের বহুসংখ্যক বাছা বাছা স্বাস্থ্যবান গরু এনে সেখানে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া পোলট্রি আছে, সেখানে আছে প্রচুর মুরগীর ডিম রোগী ও ছোটদের প্রয়োজনে। আশ্রমের মধ্যে আছে এক নিজস্ব বেকারী, স্বতন্ত্র ময়দার কল ও তেলের কল।

এ ছাড়া দরজী বিভাগ আছে। সেখানে নতুন জামা তৈরী হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্যই সেখান থেকে প্যাণ্ট, জামা, ব্লাউজ প্রভৃতি প্রয়োজনমতো প্রস্তুত করে দেওয়া হয়। জুতো-প্রস্তুত বিভাগ

রয়েছে স্বতন্ত্র, সেখান থেকে প্রত্যেকে বছরে একজোড়া করে স্যাণ্ডেল, জুতো আর খড়ম পেয়ে থাকে।

আশ্রমের একটি বড়ো রকমের ছাপাখানা আছে, আর আছে কয়েকটি আধুনিক মনোটাইপ মেসিন। সেখানে প্রায় দশ বারো রকম ভাষাতে বই ও সাময়িক পত্র ছাপা হয়।

টুকরো টুকরো কাগজপত্র ও ছেঁড়া ন্যাকড়া প্রভৃতি কোন কিছুই ফেলা যায় না। সেগুলোকে সংগ্রহ করে নানারকম কার্ডবোর্ড তৈরি করা হয়, মোটা কাগজও তৈরী হয়। কাগজ তৈরির কলও গড়ে উঠেছে সেখানে।

তা ছাড়া নানারকম মেরামতি কাজের জন্য দুটি বড় বড় কারখানা আছে। সেখানে মোটরগাড়ি ও নানারকমের যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়, তৈজসপত্র ঢালাই করা হয়, স্প্রে-পেইন্টিং করা হয় এবং হয় আরো নানারকমের কাজ। যারা এসব বিষয়ে শিক্ষা নিতে চায় তাদের সেখানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

রোগের চিকিৎসার জন্য অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদীয় ওষুধ দেবার ব্যবস্থা আছে। দাঁতের বিভাগ ও পরীক্ষাদির জন্য স্বতন্ত্র একটি ল্যাবরেটরীও সেখানে আছে। আর আছে সেখানে একটি হাসপাতাল। কলকাতার একটি বড় হাসপাতালের খ্যাতনামা সার্জন মায়ের আশ্রয় নিয়ে সেখানে গড়ে তুলেছেন এক আধুনিক উন্নত ধরনের হাসপাতাল।

আশ্রমের খরচ মাসে লক্ষাধিক টাকা। এ টাকা যে কিভাবে আসছে, কিভাবে খরচ হচ্ছে সে খবর কেউ জানে না, জানেন কেবল মা। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনার সমস্ত কৃতিত্বই মায়ের। তাঁর এ এক অভিনব আদর্শ রাজ্যগঠন।

জগন্মাতার সাক্ষাৎ

এক সময়ে শ্রীঅরবিন্দকে একজন প্রশ্ন করেন—আমাদের মা যিনি এখানে রয়েছেন, ইনিই কি সেই মা যাঁর সম্বন্ধে আপনার 'মা' বইখানিতে বিশেষ ব্যাখ্যান করে লিখেছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ জবাব দিলেন—হ্যাঁ।

দ্বিতীয়বার ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—ইনিই কি তবে ব্যষ্টি-রূপিণী জগন্মাতা, অর্থাৎ স্বয়ং জগন্মাতাই কি তাঁর বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত সবকিছু বৃহত্তর শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এই সাকার দেহ ধরে এখানে অবতীর্ণা হয়েছেন ?

শ্রীঅরবিন্দ এবারও জবাব দিলেন—হ্যাঁ।

তৃতীয়বার প্রশ্ন করা হলো—স্বয়ং আদ্যাশক্তি জগন্মাতাই কি আমাদের ওপর তাঁর অপার স্নেহের বশে এই ভ্রান্তি, মিথ্যা, তমিস্রা ও মৃত্যুপূর্ণ জগতে আমাদের কাছে সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছেন ?

এ প্রশ্নেরও জবাব দিলেন শ্রীঅরবিন্দ—হ্যাঁ।

তিনবার শ্রীঅরবিন্দের সেই একই উত্তর, ইনিই স্বয়ং জগন্মাতা। পূর্ণযোগে সাফল্য পেতে হলে আমাদের একান্তভাবে এই জগন্মাতার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হবে।

কিন্তু এই কথাটির প্রকৃত অর্থ কি ? জগন্মাতা আমরা কাকে বলি ? জগৎপিতা ও জগন্মাতা কি তাহলে দুই স্বতন্ত্র জিনিস, স্বতন্ত্র সত্তা ? তা নয়। বিশ্বপিতা ও জগন্মাতা, বিধাতা ও শক্তি, সৎ ও চিৎ, পুরুষ ও প্রকৃতি, নারায়ণ ও লক্ষ্মী, শিব ও শিবানী, ঈশ্বর ও ঈশ্বরী এই জোড়া জোড়া ভাবগুলি নামে স্বতন্ত্র শোনালেও আসলে তা

একই জিনিস, দুই বিভিন্ন অংশে ভাগ করে দেখানো একই সত্তা। চৈতন্যস্বামী যেমন বলতেন, একটি ছোলাকে ছাড়িয়ে তাকে দুই দানাতে ভাগ করাও যায় আবার না করাও যায়, এও তেমনি। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ভগবান মূলতঃ এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর এই জগন্মাতা অংশের ভিতর দিয়েই নিজেকে সারা বিশ্বে অভিব্যক্ত করেছেন, আর এই মাতৃ-অংশের ভিতর দিয়েই সেই মূলের নাগাল পাওয়া যাবে।

কিন্তু জগন্মাতার নিজস্ব কোন একটা বিশেষ চেহারা নেই। তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, কল্পনাতীত। তিনি বহুবিচিত্র। শ্রীঅরবিন্দ জগন্মাতার মোটামুটি চাররকম অভিব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা করেছেন—কোথাও বা তিনি মহেশ্বরী, কোথাও বা মহাকালী, কোথাও বা মহালক্ষ্মী, কোথাও বা মহাসরস্বতী।

শ্রীঅরবিন্দ বলকেন, মোটামুটি এই চার রকম ভাবেই জগন্মাতা তাঁর নানাবিধ শক্তিরূপের প্রকাশ করেন। এর মধ্যে যিনি মহেশ্বরী তিনি হলেন জ্ঞান ও করুণাস্বরূপা, যিনি মহাকালী তিনি হলেন বলবীর্যস্বরূপা, যিনি মহালক্ষ্মী তিনি হলেন সৌন্দর্য ও সংগতিস্বরূপা, যিনি মহাসরস্বতী তিনি হলেন শৃঙ্খলা ও পূর্ণ-সিদ্ধিস্বরূপা।

জগন্মাতার আরো অনেক শক্তিরূপ আছে কিন্তু আমাদের জগতের পক্ষে এই চারটিই প্রধান। এই চার শক্তি নিয়েই জগন্মাতা আমাদের মধ্যে সশরীরে বিরাজ করছেন।

শ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ যেমন অপূর্ব তেমনি বিচিত্র।

মা নিজে তাঁর পূর্বজীবন সম্বন্ধে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে চান না। এবিষয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করলে তিনি নীরব থাকেন।

একবার ১৯২০ সালে মাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি ভারতে এলেন কেন, আর শ্রীঅরবিন্দকেই বা জানলেন কেমন করে? তিনি মুখে কিছু না বলে একটি পত্রে তাঁর জবাব দিয়েছিলেন। সেই পত্রটি হলো এই—

"তুমি জানতে চেয়েছিলে যে কখন কেমন ভাবে এটা আমার প্রথম বোধ হলো যে, জগতে আমি বিশেষ কোন ভগবৎ-কর্ম-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি, আর কেমন করে আমি শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান পেলাম?

আমার আদিষ্ট কর্ম সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান যে আমার কখন হয়েছে, সে কথা বলা কঠিন। আমার মনে হয় যে এই চেতনাকে নিয়েই আমি জন্মেছিলাম, পরে মন ও মস্তিষ্কের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই চেতনা ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও পূর্ণতর হয়ে উঠল।

"এগারো থেকে তের বছরের মধ্যে উপর্যুপরি আমার মধ্যে এমন সব আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসতে লাগল যাতে আমি কেবল যে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম তাই নয়, সঙ্গে এটাও জানলাম যে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলন হওয়াও নিশ্চয়ই সম্ভব, মানুষের চেতনাতে ও কর্মে তাঁর অভিব্যক্তির পূর্ণ উপলব্ধি মেলাও সম্ভব। আর দিব্যজীবন লাভের দ্বারা জগতে তাঁকে অভিব্যক্ত করতে পারাও সম্ভব। এই অনুভূতি ও বোধ এবং কিভাবে জগতে একে সার্থক ও কার্যকরী করে তোলা যায় তারই শিক্ষা আমি পাচ্ছিলাম আমার ঘুমের অবস্থায় নানারকম গুরুর কাছ থেকে, তাদের কাউকে কাউকে আমি এই স্থূল জগতেও পরে দেখতে পেয়েছি! তারপরে যখন আমার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উন্নতি খানিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তখন এঁদেরই মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও প্রগাঢ় হয়ে উঠল; তখন ভারতের দর্শনতত্ত্ব ও

ধর্মশাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে আমি খুব কম কথাই জানতাম, তবু তখন থেকে আমি তাঁকে নিজেই কৃষ্ণ বলে ডাকতে শুরু করলাম। আমি মনে মনে জানতে পারলাম যে পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে একদিন আমার সাক্ষাৎ হবেই এবং তাঁরই সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে আমার আদিষ্ট দিব্যকর্ম সাধন করতে হবে।

"ভারতবর্ষকেই আমি আমার মাতৃভূমি বলে বরাবর ভালবেসে এসেছি—১৯১৪ সালে আমার এদেশে এসে উপস্থিত হবার প্রথম সৌভাগ্য ঘটে।

"শ্রীঅরবিন্দকে দেখবামাত্রই আমি চিনতে পারলাম, ইনিই আমার সেই আগেকার পরিচিত বিশেষ ব্যক্তি যাঁকে আমি কৃষ্ণ বলে ডেকেছি।"

শ্রীঅরবিন্দকে কোন ব্যক্তি একবার প্রশ্ন করেছিলেন—"অনেকে বলে যে মা আগে ছিলেন আমাদেরই মতো মানুষ, তারপরে তিনি ক্রমশঃ জগন্মাতার স্বরূপ হয়ে উঠলেন, একথা কি ঠিক?"

তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন—"তা নয়, তিনি গোড়া থেকেই তাই। ভগবান যখন মানুষরূপে অবতীর্ণ হন তখন তিনি মানুষের বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে এখানে থেকে তাদের দেখিয়ে দেন যে কেমন করে সাধারণ মানুষ হয়েও এপথে চলা যায় কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর ভগবত্তাকে ছেড়ে আসেন না। এক্ষেত্রে তাঁর ভিতরকার দিব্যচেতনারই ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটতে থাকে, সেটা গোড়ায় মানুষ থেকে পরে ভগবানে রূপান্তরিত হওয়া নয়। মা তাঁর শৈশবকাল থেকেই ভিতরে ভিতরে ছিলেন মানুষের উপরে।"

শ্রীমা বিচিত্ররূপিণী।

সারাদিনই নানাকাজে ব্যস্ত থাকেন মা। বিশ্রাম বলে তাঁর কিছুই নেই। বছরের মধ্যে কোনদিন তাঁর ছুটি নেই।

অতি সাদাসিধে মায়ের ঘর। কোন খাট বিছানা নেই, আছে মাত্র টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ও একটি সোফা। ঘুমও নেই যেন তাঁর চোখে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা নানারকম কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সব নিয়মমাফিক। সমস্ত দিনটা এবং রাত দুটা পর্যন্ত তাঁর কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। কেবল রাত দুটো থেকে চারটা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা তাঁর কর্মবিরতি। সেই দু'ঘণ্টা তিনি সোফায় বসেই কাটান। সেটাই তাঁর ঘুম—সেটাই তাঁর বিশ্রাম। কেউ কেউ বলেন যে মা ঐ সময়টিতেও না ঘুমিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে সমাধি অবস্থায় থাকেন। কথাটা হয়তো সত্য। কারণ নিজেই মা বলেন—ঘুমের চেয়ে ধ্যান ও সমাধিতে বেশী বিশ্রাম লাভ করা যায়।

ভোর চারটা থেকে আবার শুরু হয় তাঁর কাজ।

সকালে সোয়া ছটায় তিনি বাইরের বারান্দায় একবার বেরিয়ে সকলকে দর্শন দেন। যে আশ্রম-বাড়িতে মা থাকেন তার ওপর-তলার পিছনের দিকে একটি বারান্দা আছে, মা সেখানে গিয়েই কিছুক্ষণ দাঁড়ান। ভক্তেরা সেই সময়ে তাঁকে দর্শন করবার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করতে থাকে। নীচের থেকেই তারা তখন মাকে দর্শন করে।

এর পরেই তিনি ফিরে যান তাঁর নিজের ঘরে। সেখানে চলতে থাকে তাঁর কাজের পর কাজ। খাওয়া-দাওয়া অতি সামান্য।

দুপুরে দু'ঘণ্টা চিঠিপত্রাদির উত্তর দেবার জন্য সময় তাঁর নির্ধারিত। আশ্রমের সেক্রেটারী ঐ সময়ে মায়ের কাছে গিয়ে চিঠিপত্রগুলি পড়ে শোনান এবং যেগুলির জবাব দেওয়ার দরকার তা লিখে নেন।

বহুদিন পর্যন্ত বিকেল সাড়ে চারটার সময় রোজ মা খেলার

মাঠে টেনিস খেলতে যেতেন। এই পরিণত বয়সেও তাঁর কোনদিন এতে ব্যতিক্রম হতো না। এক ঘণ্টা রীতিমত ছুটোছুটি করে তিনি টেনিস খেলতেন।

সন্ধ্যার মধ্যে আশ্রমের প্রায় সকলেই সমবেত হয় খেলার মাঠে। আশ্রমবাসীরা একত্রিত হয়ে রীতিমত সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করে। ঐ কুচকাওয়াজে ছেলে-বুড়ো সকলেই যোগ দেয়।

মা বরাবরই সেখানে উপস্থিত থাকতেন। খেলাধুলার পরে আবার সকলে সমবেত হয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াতো। তখন সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে ধ্যান করতো। ধ্যান শেষ হয়ে যাবার পর মা প্রত্যেকের হাতে তুলে দিতেন মুঠো মুঠো লজেঞ্জ বা সল্টেড বাদাম।

খেলাধুলা হয়ে যাবার পরে নির্দিষ্ট দিনে মা ছেলেমেয়েদের দলকে নিয়ে পড়াতে বসেন। বুড়োরাও কেউ কেউ সেই দলের মধ্যে এসে যোগ দেন। সাধারণতঃ তিনি ফরাসী ভাষা শেখান, কিন্তু সেই শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাদের আরো অনেক রকমের জিনিস শেখা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার ভিতরে তিনি অনেক আশ্চর্য রকমের গল্প বলেন, তার মধ্যে তাঁর ছেলেবেলাকার গল্পও অনেক থাকে। প্রত্যহ তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রায় দুই-আড়াই ঘণ্টা ক্লাস করেন। রাত নটার পরে তিনি তাঁর ঘরে ফেরেন।

এইগুলি ছিল তাঁর নিয়মিত কার্যক্রম। ১৯৬২ সালের পর থেকে সেই কার্যক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে।

নানারকম কলাবিদ্যাতেও মায়ের বিশেষ দক্ষতা। ছবি আঁকতে পারেন ভালো। সংগীত-বিদ্যাতে আছে তাঁর পারদর্শিতা, অর্গান তিনি বাজাতে পারেন ভালো।

সাহিত্যেও দখল আছে শ্রীমায়ের। তাঁর সব রচনায় আছে ভাবের গভীরতা।

দেশে বিদেশে শ্রীঅরবিন্দের ও মায়ের ভক্তের সংখ্যা অজস্র। তারা সমস্ত শুভকর্মের ব্যাপার মাকে ও শ্রীঅরবিন্দকে জানায়—তাঁদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। শ্রীঅরবিন্দের হয়ে এবং মা নিজে আশীর্বাদ জানান তাদের। শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পর মা একাই আশীর্বাদ পাঠাচ্ছেন নিয়মিতভাবে।

কেবল মানুষের প্রতি নয়, পশুপাখিদের প্রতিও তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। মায়ের নিজের একটি অ্যালসেসিয়ান জাতীয় প্রকাণ্ড কুকুর ছিল। সে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরত। কুকুরটি এখন আর নেই। একটি বেড়ালও ছিল মায়ের, সে নাকি ঠিক মানুষের মতোই চোখ বুজে বসে ধ্যান করত। বেড়ালটির পায়ে একবার কাঁকড়াবিছে কামড় দেয়। সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মায়ের কাছে গিয়ে পা'টি তুলে মাকে দেখাতে থাকে। মা তাকে নিয়ে যান শ্রীঅরবিন্দের কাছে। শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে বেড়ালটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাতেই বেড়ালটি সুস্থ হয়ে ওঠে।

যোগসাধনার আদর্শ

ঋষি অরবিন্দের যোগসাধনার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য কি তা বিখ্যাত নাট্যকার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়ের লিখিত বিবরণ থেকে অনেকটা জানা যায়। দিলীপকুমার রায় বহুদিন আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল এক প্রকারের; কিন্তু যোগে যতই তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন, উপলব্ধি ততই প্রগাঢ় হতে লাগল। তাঁর উদ্দেশ্যও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে লাগল। এ বিষয়ে দিলীপকুমারের সঙ্গে অরবিন্দের যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে, দিলীপকুমার তা প্রকাশ করেছেন তাঁর তীর্থঙ্কর পুস্তকের 'শ্রীঅরবিন্দ অধ্যায়ে'।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"আমার নিজেরও এক সময়ে ইচ্ছা হত যোগবলে জগৎটাকে মুহূর্তে দেই বদলে—মানব প্রকৃতিটাকে ঢেলে সাজাই—জগতে মন্দ যা কিছু আছে, শোচনীয় যা কিছু আছে এই দণ্ডে লুপ্ত করে দেই আমার সাধন বলে। আমি প্রথম এসেছিলাম এখানে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে, যদিও আমার পণ্ডিচেরীতে আসার প্রধান কারণ—আমি এখানে সাধনা করবার আদেশ পেয়েছিলাম।

"লেলেকে আমি তাই বলি যে, যোগসাধনা করতে আমি রাজী, কিন্তু কর্মসাধনা ছেড়ে নয়। দেশ ও কাব্য দুই-ই আমি অত্যন্ত ভালবাসতাম।....লেলে রাজী হলো, দিল আমাকে দীক্ষা। কিছুদিন পরে আমাকে নিজের অন্তর্নির্দেশ মেনেই চলতে বলে বিদায় নিল। আমি পণ্ডিচেরী এসে পূর্ণ যোগসাধনায় বসলাম।

কিন্তু সাধনা করতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিই গেল বদলে। আমি দেখলাম যে, এখনি এসব করা সম্ভবপর,—ভাবতাম শুধু আমার অজ্ঞানের জন্য।"

দিলীপকুমারের মনে যেন খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলেন—"অজ্ঞান?"

অরবিন্দ উত্তর করলেন—"হ্যাঁ, কেননা আমি এই সত্যটা তখন জানতাম না যে, জগতের মানুষকে উদ্ধার করতে হলে একজন মানুষের পক্ষে বিশ্বসমস্যার চরম সমাধানে পৌঁছনই যথেষ্ট নয়—তা সে মানুষ যতই কেন অসামান্য হোক না। শুধু নিজেই অমৃতলোকে পৌঁছলেই হবে না—বিশ্বমানবকেও হতে হবে অমৃতলাভের অধিকারী। কিন্তু তার জন্য কালও অনুকূল হওয়া চাই। আসল সমস্যাটা হলো ঐখানে। শুধু উপরের আলো নামতে রাজী হলেই হবে না—সে নামতেও পারে থেকে থেকে,—কিন্তু তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, যদি নীচের আধার-গ্রহীতা আধার ধারণ করতে না পারে।…এ বিশ্বজগতের দুর্দৈবের কোন আশু সমাধান বা অমোঘ ঔষধ চমৎকার করে বাতলে দেওয়া অসম্ভব। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ কথার সাক্ষ্য মিলবে।"

দিলীপকুমার জিজ্ঞেস করলেন—"তাহলে আপনি সাধনা করছেন কিসের জন্য? নিজের মুক্তি বা সিদ্ধির জন্য?"

শ্রীঅরবিন্দ বললেন—"না—তাহলে আমার এত সময় লাগত না।…আমি চাই উর্ধ্বতর লোকের এমন কোন আলো এ জগতে আনতে, এমন কোন শক্তি এখানে সক্রিয় করতে—যার ফলে মানবপ্রকৃতির মধ্যে হবে একটা খুব বড় রকমের অদলবদল, ওলটপালট—এমন কোন দিব্যশক্তি যা এপর্যন্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হয় নি।"

এই হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হল।

সমস্তটা পাঠ না করলে সব কিছু পরিষ্কার বুঝা যায় না। তবু এতে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদর্শোপলব্ধি সম্বন্ধে তাঁর কী অটুট বিশ্বাস! তিনি বললেন—"আমি নিশ্চিত জানি যে অতিমানস সত্য, তার আবির্ভাবও যথাসময়ে হবেই হবে।...আমার বিশ্বাস ও ইচ্ছা বলে যে এ যুগেই ঘটবে এ অঘটন।...এই অতিমানস শক্তি নিজের পথ নিজে করে নিতে পারে যদি সে একবার নামতে পারে—অর্থাৎ যদি পার্থিব চেতনা তাকে একবার ধারণ করতে পারে।"

দিলীপকুমার জিজ্ঞেস করলেন—"এ শক্তির কাজ মুষ্টিমেয় জনকয়েকের ওপর, না অনেকের ওপর?"

শ্রীঅরবিন্দ জবাব দিলেন—"পূর্ণযোগ যদি আমার মতন দু'একজনের জন্য হত তাহলে তার মূল্যও হত খুব কম। কেননা আমি তো আর এই বাস্তব জীবনকে ছাড়তে চাইছি না—চাইছি তার একটা আমূল গভীর পরিবর্তন।"

দিলীপকুমার জিজ্ঞেস করলেন—"কিন্তু এ পরিবর্তনের জন্য আপনার পরবর্তীদের আপনার মতন অমানুষিক সাধনা করতে হবে না তো?"

শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন। বললেন—"না। আর করতে হবে না বলেই আমি বলেছিলাম অনেকদিন আগে যে আমার যোগ শুধু আমার জন্য নয়—সব মানুষের জন্য। যাকে অচিন বনের মধ্য দিয়ে প্রথম পথ কেটে চলতে হয়, তাকে অনেক দুঃখই সইতে হয় পরবর্তীদের পথ সুগম করতে।"

যোগসাধনে গভীরতম ভাবে নিমগ্ন হবার পর থেকে বাইরের জগতের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তখন থেকে বছরে তিন দিন মাত্র তিনি সকলকে দর্শন দিতেন।

দর্শনের নির্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত নরনারীবৃন্দের জনতায় আশ্রমটি যেন বিরাট নরসমুদ্রের রূপ ধারণ করত। যাতে দর্শনার্থীদের কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, সেজন্য তাদের শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে দাঁড় করানো হতো। প্রত্যেকের হাতেই ফুলের মালা বা অন্যান্য পূজার উপচার দেওয়া হত। জনতা দাঁড়িয়ে থাকত আকুল আগ্রহে নিঃশব্দে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে শ্রীঅরবিন্দের চরণে প্রণাম করত এবং স্ব স্ব মৌন নিবেদন জ্ঞাপন করে চলে যেত। শ্রীঅরবিন্দ সকলকে স্মিতহাস্যে আশীর্বাদ করতেন।

দর্শনার্থীদের অভিজাত্য, উচ্চপদ, অর্থ, সম্মান বা অন্য কিছুরই প্রতি কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা সেখানে চলতো না। সেখানে ছোট বড় ধনী গরিব পণ্ডিত মূর্খ সবাই সমান।

শ্রীঅরবিন্দের সমাধি ঃ পণ্ডিচেরী
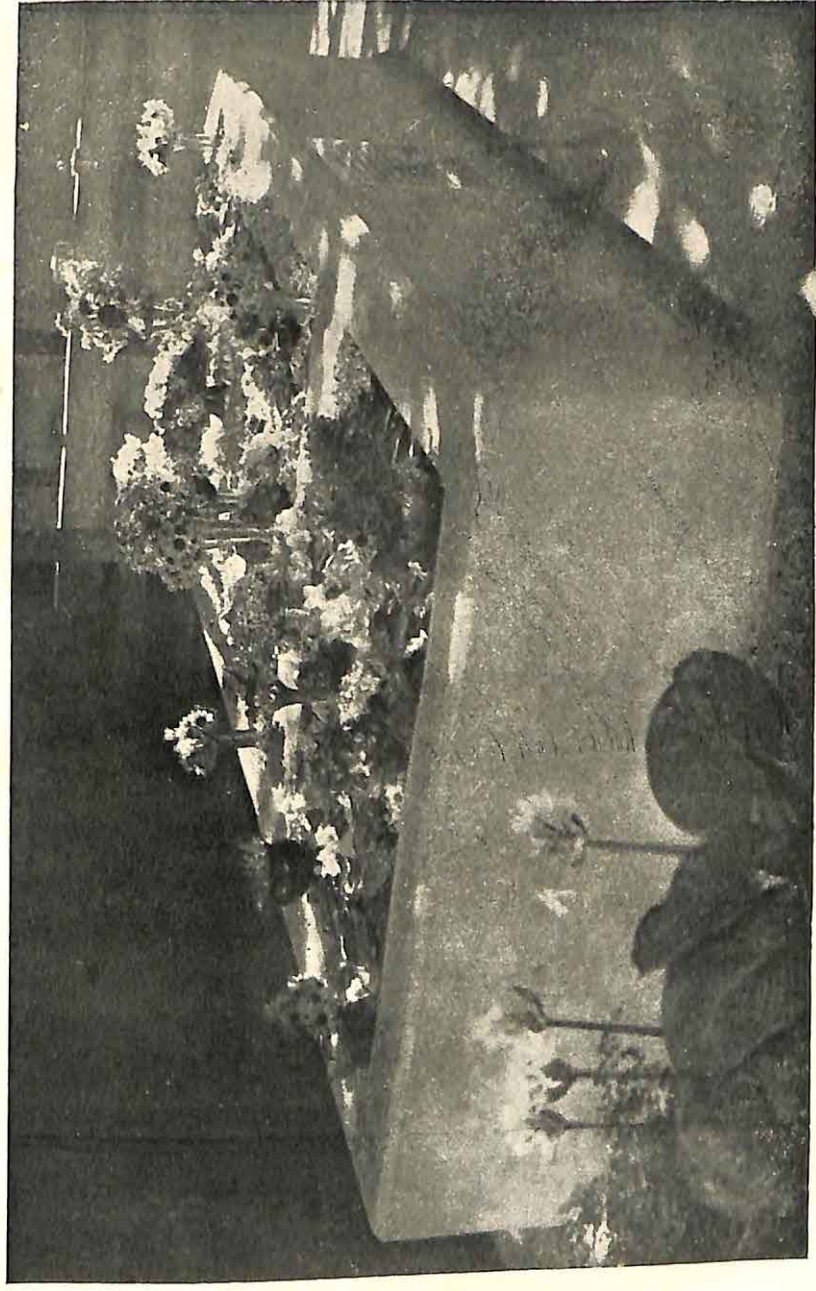
স্বরাজ ও আত্মপ্রত্যয়

পণ্ডিচেরীতে আশ্রম স্থাপনের যে আদর্শ—সে আদর্শ অরবিন্দের জীবনে বিকাশলাভ করেছিল অনেককাল আগে থেকেই। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলেই তা উপলব্ধি করা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ জীবনে কখনো পল্লীগ্রামে বাস করেন নি; অথচ পল্লীই যে দেশের প্রাণ এবং পল্লীর শোচনীয় অবস্থাই যে বাঙ্গালার দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ, তা তিনি মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিলেন; তাই পল্লী-সংস্কারের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল।

কিশোরগঞ্জে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,—

"ভারতবর্ষে জীবন ও তার বিবৃদ্ধির উপায়গুলি পূর্বে আমাদের নিজেদের হাতে ছিল। আমাদের গ্রামগুলি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। জমিদাররা ছিলেন গ্রামগুলি ও কেন্দ্রীয় শাসনচক্রের যোগসূত্রের উপায় এবং কেন্দ্রীয় শাসনচক্রে জাতির প্রাণের সাড়া অনুভূত হত। এই সকল উপায়ই এখন নষ্ট বা নষ্টপ্রায় হয়েছে।

জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের শক্তির কেন্দ্র-গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আমাদের বিবৃদ্ধির জন্য এদের একান্ত আবশ্যক। এদের সর্বপ্রধান হচ্ছে আমাদের আত্মনির্ভরশীল ও স্বতন্ত্র গ্রামগুলি। এদের উপর আর সমস্ত নির্ভর করে। ভারতের জীবনযাত্রার ভিত্তি ও ভারতের প্রাণ-শক্তির সকল রহস্য এইখানেই নিহিত রয়েছে। স্বরাজের প্রবর্তন করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের গ্রামগুলির প্রতিই দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি বিষয়েও আমাদের বিশেষ সাবধান হতে হবে।

আমাদের নূতন জাতিগঠনের দিনে গ্রামগুলিকে পরস্পর হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। প্রত্যেকটি গ্রামকে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ করতে হবে। গ্রামগুলি আবার জেলার সঙ্গে, জেলাগুলি প্রদেশের সঙ্গে, প্রদেশগুলি আবার সমগ্র দেশের সঙ্গে এক উদ্দেশ্যে মিলিত থাকবে। পল্লীই জাতির অবয়বের জীবকোষ-স্বরূপ। জাতির উন্নতি-বিধানের জন্য এই জীবকোষগুলিকে সুস্থ ও সবল করতে হবে। পল্লীর উপরেই স্বরাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পল্লী-সমিতি একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান কেবল তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনার ক্ষেত্র নয়, কিন্তু প্রকৃত কর্ম-চেষ্টার যন্ত্রস্বরূপ। এই প্রতিষ্ঠান গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করবে, সেখানে শিক্ষালাভ করে বালকেরা দেশহিতৈষী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। পল্লীর যাবতীয় বিচার পল্লীতেই সমাধান করতে হবে। আত্মরক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় লোকহিতকর কার্য,—সকল ব্যবস্থাই এই সমিতি হতে হবে।

গ্রামগুলিকে পুনরায় আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে, পর-মুখাপেক্ষী করে রাখলে চলবে না। স্বরাজের প্রধান উপকরণ হচ্ছে, আত্মনির্ভরতা ও স্বাতন্ত্র্য—এবং এই উভয় গুণের উৎকর্ষ হতে পারে পল্লী-সমিতির দ্বারা।

স্বরাজলাভের অন্য একটি উপায়, জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদ্বোধন। এই জাগরণের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে একটি দুর্গম ব্যবধান। পল্লী-সমিতি এই ব্যবধান দূর করতে পারে। গ্রামেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মিলিত হতে পারে, এবং এই মিলনের ফলে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিতেরাও স্বরাজের তাৎপর্য বুঝতে পারবে। তারা পল্লী-স্বরাজ প্রথমে বুঝে পরে ক্রমে ক্রমে দেশের স্বরাজের অর্থ বুঝবে।"

সাধারণ মানুষ স্ত্রীকে নিয়ে যেমন গৃহস্থালী করে, অরবিন্দের ভাগ্যে তা ঘটেনি; তবে মৃণালিনী দেবীকে তিনি উপেক্ষার চক্ষে দেখেননি। তিনি তাঁকে ঠিক সহধর্মিণী ভাবেই দেখতেন,—স্ত্রীকে তাঁর ধর্মসাধনের সহায়িকা বলে মনে করতেন।

নিজের জীবনে আলোকপাতের সঙ্গে-সঙ্গে অরবিন্দ মৃণালিনীকে উজ্জ্বল আলোকের সন্ধান দিয়ে তাঁর জীবনকে উন্নততর করবার প্রয়াস পেলেন। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ধর্মাচরণের অভিলাষ তাঁর ছিল না। স্ত্রীকে লিখিত তাঁর পত্রগুলি হতে আমরা তার পরিচয় পাই।

পত্রগুলি বোমার মামলার সময় পুলিসের খানাতল্লাশিতে বের হয়ে পড়ে; নতুবা এই গোপনীয় পত্রগুলিতে যে অমূল্য রত্ন নিহিত ছিল, তা লোকে জানতে পারত না এবং তার ফলে অরবিন্দের বাহ্য আচরণ দেখে তাঁকে পত্নীত্যাগী সন্ন্যাসী বলেই মনে করত।

এখানে সেই পত্রগুলি হতে কিছু-কিছু উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—

"আমার তিনটি পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামি এইঃ আমার দৃঢ়বিশ্বাস—ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের। যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে, আর যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার; যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট হইতে ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না,

সে চোর। এ পর্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া, চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাব চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

"আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। আর নয়, সে-পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে দেওয়ার অর্থ কি? অর্থ—ধর্মকার্যে ব্যয় করা। —পরোপকার ধর্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশকোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের মঙ্গল করিতে হয়।

"কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া-পরিয়া যাহা সত্যি-সত্যি দরকার, তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা; তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই, আমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে।

"দ্বিতীয় পাগলামি সম্প্রতি ঘাড়ে চাপিয়াছে, পাগলামিটা এই: যে-কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজ-কালকার ধর্ম, ভগবানের নাম কথায়-কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখানো আমি ধার্মিক। তাহা আমি চাই না। যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোনও পথ থাকিবে, সে-পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সে-পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম বলে—নিজের শরীরের, নিজের

মনের মধ্যে সেই পথ আছে। সে-পথে যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্মের কথা মিথ্যা নয়; যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে, সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা, তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই।

"তৃতীয় পাগলামি এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে; শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল।...

"এখন বল, তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? আমরা বলি, স্ত্রী স্বামীর শক্তি; মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি দেখিয়া, তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।"

মৃণালিনী আজ আর ইহজগতে নেই। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে গমনের নয় বছর পরে তিনি পরলোক গমন করেন।

নিজের জীবনকে মৃণালিনী অভিশপ্ত বলে কখনো মনে করেননি। বরং অরবিন্দের মত অমন মহাপুরুষ স্বামী পেয়েছিলেন বলে নিজেকে তিনি ভাগ্যবতী বলে মনে করতেন।

নিবেদিতা সন্নিধানে

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বহু মনীষীর পরিচয় ঘটেছিল। মিস্ মার্গারেট অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতার সান্নিধ্যেও এসেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

মিস্ মার্গারেট নোবেল ভারতে এসে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হলেন। ভগিনী নিবেদিতা নাম নিয়ে নেমে পড়লেন সমাজসেবা-মূলক কাজে।

ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়ারও তখন পরিবর্তন ঘটেছে। ইংরেজদের দেশের মেয়ে হয়েও নিবেদিতা ভারতের মর্মবাণী নিজের মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলেন।

বাংলাদেশ হল নিবেদিতার কর্মের কেন্দ্র। সেই বাংলাদেশের কর্মসাধনার ভিতর দিয়েই ভারতের কর্মসাধনার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে চাইলেন।

নিবেদিতা গেলেন বরোদায়। সেখানে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হল। প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা বুঝতে পারলেন—এই মানুষটির ভেতরে রয়েছে এক ঐশ্বরিক ক্ষমতা। এঁর দ্বারা দেশের অনেক কিছু মঙ্গলসাধন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অরবিন্দকে বললেন—আপনি বাংলায় চলুন। আপনার স্থান বরোদার এই শিক্ষাক্ষেত্রে নয়—আপনার স্থান বাংলার কর্মক্ষেত্রে। বাংলাদেশ আপনাকে ডাকছে।

শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার ডাকে তখন সাড়া দিতে না পারলেও মনে মনে তাঁর কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই অরবিন্দকে কিছুকাল পরেই বরোদা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

তারপর শ্রী অরবিন্দ ক্রমশঃ রাজনৈতিক জীবনে জড়িয়ে পড়লেন। নিবেদিতাও সেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারলেন না।

বাংলাদেশে দেখা দিল বৈপ্লবিক আন্দোলন। ব্যাপক ধরপাকড়, ফাঁসি, দ্বীপান্তরের পালা চলতে লাগল। নিবেদিতা কিছুদিনের জন্য তখন ইওরোপে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই এই সব খবর শুনে তাঁর মন দুঃখে ও বেদনায় ভরে উঠল। কিভাবে তিনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারবেন সেই উপায় খুঁজতে লাগলেন।

মনে মনে স্থির করলেন নিবেদিতা—বাংলার বিপ্লবীদের দুঃখ নির্যাতন লাঘব করবার জন্য তাদের সাহায্য করবেন। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন।

নিবেদিতা ভারতে ফিরে অর্থসংগ্রহ করতে লাগলেন। সেই অর্থ দিয়ে তিনি চন্দননগরে একটি বাড়ি কিনলেন। সেখানে রাজবন্দীরা আশ্রয় পেতে লাগল।

নিবেদিতাও সরকারী রোষদৃষ্টিতে পড়লেন। পোশাক পালটালেন নিবেদিতা। নিজের নামও পালটালেন।

সরকারী দৃষ্টি থেকে সেই সময়ে বেলুড় মঠও রেহাই পায় নি। সরকারের ধারণা, বিপ্লবীরা পলাতক হয়ে ওখানে আশ্রয় নিচ্ছে।

আলিপুর কোর্টে বিপ্লবীদের বিচার হল। অরবিন্দের হল এক বছর নির্জন কারাবাস। সেই কারাদণ্ডের সংবাদ শুনে নিবেদিতা খুবই মর্মাহত হলেন।

এক বছর পর এল অরবিন্দের মুক্তির তারিখ। সেদিন নিবেদিতার কী আনন্দ! সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য নিবেদিতা তাঁর স্কুল বাড়িটাকে ফুল পাতা দিয়ে সাজালেন।

ধর্মযোগীর আহ্বান বেরুল আবার অরবিন্দের কণ্ঠ থেকে। নিবেদিতাও সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ দুটো পত্রিকা

প্রকাশ করলেন। একটি 'কর্মযোগিন্', আর একটি 'ধর্ম'। 'কর্মযোগিন্' ১৯০৯ সালে ১৯শে জুন প্রথম প্রকাশিত হয়। নিবেদিতা 'কর্মযোগিন্'-এ লিখতে শুরু করলেন।

অরবিন্দ কলকাতায় কয়েকদিন সুকুমার মিত্রের বাড়িতে ছিলেন। নিবেদিতা এবং আরও কয়েকজন সেই বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

সরকার অরবিন্দের উপর আবার সন্দিহান হয়ে উঠলেন। নিবেদিতা একদিন খবর পেলেন সরকার অরবিন্দকে নির্বাসনে পাঠাবার চক্রান্ত করছেন।

নিবেদিতা অরবিন্দকে সতর্ক করে দিলেন। অবিলম্বে তাঁকে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে যাবার পরামর্শ দিলেন।

সেই সময়ে 'কর্মযোগিন্'-এ একটি চিঠি ছাপা হল। তাতে অরবিন্দ বিশ্লেষণ করলেন তাঁর নীতি। সরকার কিছুদিন চুপচাপ রইলেন। তারপর অবশ্য যেতেই হল অরবিন্দকে। প্রথমে গেলেন চন্দননগর, তারপর পণ্ডিচেরীতে। যাওয়ার আগে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলেন না। পরদিন একজন লোক নিবেদিতাকে খবর দিল, 'কর্মযোগিন্-এর ভার অরবিন্দ দিয়ে গেছেন নিবেদিতার উপর।

নিবেদিতা কর্মযোগিন্'-এর দায়িত্ব নিলেন। তাতে নিজে প্রবন্ধ লিখে নাম দিতে লাগলেন অরবিন্দের।

১৯১০ সালের ২রা এপ্রিল 'কর্মযোগিন্'-এর যে সংখ্যা প্রকাশিত হয় তাতে নিবেদিতা অরবিন্দের ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। কারণ তিনি খবর পেয়েছেন, এখন আর কোন ভয় নেই। অরবিন্দ নিরাপদে পণ্ডিচেরীতে পৌঁছে গেছেন।

বাংলার মাটিতে শ্রীঅরবিন্দের শেষ ধ্বজাটি সগর্বে তুলে ধরে রেখেছিলেন নিবেদিতা।

'কর্মযোগিন্' উনচল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশ্বকবির শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপ যাত্রার পথে ২৯শে মে ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে সাক্ষাৎ করেন। পরে ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ একটি প্রবন্ধাকারে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,—

"অনেকদিন মনে ছিল, অরবিন্দ ঘোষকে দেখবো। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো। তাঁকে দেখে যা' আমার মনে জেগেছে, সেই কথা লিখ্‌তে ইচ্ছা করি।"

* * *

"আমাদের ফরাসী জাহাজ এলো পণ্ডিচেরী বন্দরে। ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট করেই নামতে হলো—তা' হোক, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম,—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্ত্বা ওতপ্রোত। আমার মন বললে ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বাল্‌বেন।

কথা বেশি বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত! কোন খর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেননি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা।

মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে

রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্বমেধাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার।

আমি তাঁকে বলে এলুম,—আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে,—শৃণ্বন্তু বিশ্বে!

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!'

আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!' ”

স্বাধীনতা দিবসের বাণী

শ্রীঅরবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীনতা লাভ করবেই। বহু দেশনায়ক দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, জীবনের সর্বস্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি। শ্রীঅরবিন্দের পরম সৌভাগ্য, তাঁর জীবিতকালেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করল। সেই উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের বাণী ঐতিহাসিক বাণীর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

...."আমার জন্মদিনেই ভারতের স্বাধীনতার জন্মদিন হলো, এটা ভগবানের আশীর্বাদ। এই দিনটিতে আমি দেখছি যে জাগতিক আন্দোলনে যে সকল বিষয়ে আমি পূর্ণ সাফল্য দেখে যেতে পারব বলে আশা করেছিলাম তার অনেকগুলি আমার এই জীবনকালের মধ্যেই সফল হয়ে গেল, অন্ততঃ তা নিশ্চিত সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, যদিও আগে এগুলিকে নিতান্তই অসম্ভব স্বপ্ন বলে মনে হতে পারত।....

"এর মধ্যে প্রথম স্বপ্নটি ছিল, এমন এক বিপ্লবের সৃষ্টি যার ফলে ভারতের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হবে আর সমগ্র ভারতের মুক্তি হবে।...

"দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল সমগ্র এশিয়ার পুনরভ্যুত্থান ও মুক্তি হবে, আর মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতিকল্পে তার যে মহৎ অবদান ছিল তার সেই ব্রত আবার সে গ্রহণ করবে।

তৃতীয় স্বপ্ন ছিল, একটা বিশ্ব-মিলন, যাকে ভিত্তি করে সমগ্র মানবজাতি একটা সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর ও মহত্তর জীবন আয়ত্ত করবে। এ মিলনের পথ এখন প্রশস্ত হয়ে আসছে; তার প্রথম সূচনা এখনও ত্রুটিবহুল; কিন্তু কঠিন বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভিতরের

বেগে সে আয়োজন এগিয়ে চলেছে। এই কাজের ভিতরকার আসল গতিবেগটি এখন এসে গেছে, সে বেগ আরো বাড়বে ও নিশ্চয় তা শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে।

"হঠাৎ একটা কিছু দুর্যোগ এসে এতে বাধা দিয়ে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাকে হয়তো থামিয়ে দিতে পারে, তবুও শেষ পর্যন্ত এর পরিণাম ধ্রুব। কারণ মূলতঃ ঐক্যই প্রকৃতির কাম্য, সেইদিকেই চলেছে তার অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া। সকল জাতিরই কাম্য যে তাই এটা খুব সুস্পষ্ট, কারণ এ ছাড়া ছোটো ছোটো জাতিগুলি যে-কোন মুহূর্তে গুরুতর বিপদে পড়ে যেতে পারে, আর বড়ো বড়ো শক্তিশালী জাতিদের জীবনও নিরাপদ হয় না। সর্বজাতির স্বার্থের জন্যেই এমন একটা ঐক্য থাকা দরকার, কেবল মানুষের পঙ্গুতা ও মূঢ় আত্মপরতাই এটা হতে দেয় না; কিন্তু প্রকৃতির প্রয়োজনের বিরুদ্ধে আর ভগবৎ-ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই প্রকারের প্রকৃতিবিরোধী জিনিস চিরকাল চলতে পারে না। তবে এই ঐক্যের একটা বাহ্যিক ভিত্তিস্থাপনই যথেষ্ট নয়; সকলের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠা চাই, একটা আন্তর্জাতিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হওয়া চাই,—যখন এমন হবে যে হয়তো একই ব্যক্তি দুটি দেশকে বা ততোধিক দেশকে আপন বলে সেখানে তার নাগরিক অধিকার অর্জন করতে পারবে, আর স্বেচ্ছায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও মিশ্রণও চলবে। স্বাধীনতাবাদের চরম পরিণতি এলে তার ভিতরকার যোদ্ধৃভাবটা ঘুচে যাবে, প্রত্যেক নেশনের নিজত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতেও এ-সব সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। মানব জাতির মনে তখন এক নূতন একতার ভাব অঙ্কুরিত হবে।

"আর এক স্বপ্ন, ভারত জগৎকে দেবে তার মহামূল্য অধ্যাত্মজ্ঞান ও জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা। এ কাজও শুরু হয়ে

গেছে। ইওরোপ ও আমেরিকার মধ্যে এখন ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তরোত্তর অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। এ-কাজটি আরো বাড়তে থাকবে; এখানকার বহুতর বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ অনেকেরই দৃষ্টি আশা-ভরসা নিয়ে ভারতের দিকেই ফিরছে, আর অনেকের দৃষ্টি কেবল যে তার শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে তা নয়, এখানকার আধ্যাত্মিক সাধনারও তারা রীতিমত অনুশীলন করছে।

"শেষ স্বপ্নটি ছিল, বিবর্তনের পর্যায়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। এতে মানুষ এক উচ্চতর ও বৃহত্তর চেতনার স্তরে গিয়ে উঠবে। অতঃপর চিন্তাবৃত্তির উন্মেষের সময় থেকেই যে-সব সমস্যা নিয়ে এতকাল সে বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত হচ্ছিল তার একটা সমুচিত সমাধান করতে শুরু করবে, আর এবার সে ব্যক্তিগত পরমোৎকর্ষের ও সমাজগত সংহতির স্বপ্ন দেখবে। এ আশা এখনও আমি কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই করছি, এখনও এটা আমার নিজেরই আদর্শ, যা ভারতে আর পাশ্চাত্ত্য জগতেও অনেক প্রগতিশীল মানুষের মনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারূপে উদিত হয়েছে। প্রচেষ্টার অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এখানেই বাধাবিপত্তি আছে সব চেয়ে বেশী, কিন্তু জয় করবার গৌরবের জন্যেই তো যত বাধাবিপত্তির সৃষ্টি, আর পরমা শক্তির যদি তাই ইচ্ছা থাকে তাহলে এ সমস্তই একদিন পার হয়ে যাবে। বিবর্তনের এই অগ্রগতি যদি ঘটবার হয়, তাহলে সে বিষয়েও প্রথম প্রেরণা আসবে ভারতের দিক থেকেই, কারণ অধ্যাত্ম সত্তার উন্মেষ ও আভ্যন্তরীণ চেতনার ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়েই তা আসতে পারে, আর এখানেই তার সূচনা। তাই যদিও এই বিবর্তন ক্রিয়ার ক্ষেত্র হবে বিশ্বব্যাপী, কিন্তু তার কেন্দ্র হতে পারে এখানেই।....

"ভারতের মুক্তিদিবসে এই কথাগুলিই আমি আজ বলতে চাই আমার এ আশা সম্পূর্ণ সফল হবে কিনা, বা কত শীঘ্র তা সফল হবে, সেটা নির্ভর করছে এই সদ্যোমুক্ত নবজীবনপ্রাপ্ত ভারতেরই উপর।"

তিরোধান

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "যোগের পথ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত সোজা রাস্তা নয়।"

সোজা রাস্তা নয় বলেই শ্রীঅরবিন্দকে এপথে চলতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। বহু কৃচ্ছ্রসাধনার পর হয়েছে তাঁর সিদ্ধিলাভ।

অভীষ্ট বস্তু শ্রীঅরবিন্দ লাভ করেছেন। কিন্তু তিনি আগেই বলেছিলেন—আমার এ সাধনা নিজের জন্য নয়, আমার এ সাধনা সকলের জন্য—সারা পৃথিবীর জন্য। পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-বেদনা তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছিল, তিনি চেয়েছিলেন দুঃখ, দৈন্য ও পরাধীনতার মুক্তি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি নিজে ছিলেন একজন নির্ভীক যোদ্ধা, মনেপ্রাণে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করতেন। সেই আকাঙ্ক্ষাও তাঁর পূরণ হয়েছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে ১৯৪৭ সালে।

সংসারত্যাগী যোগী হয়েও তিনি দেশের সুখদুঃখের ভাবনাকে মন থেকে সরিয়ে দেননি। নিজের যোগসাধনার পথে তিনি যেমন ভগবানের নির্দেশ পেয়েছিলেন, তেমনি দেশের মুক্তি আন্দোলনের পিছনেও দেখেছিলেন ভগবানের ইঙ্গিত। তাই তিনি আশাবাদী ছিলেন।

অরবিন্দের পরম সৌভাগ্য এবং তাঁর জীবনে অত্যাশ্চর্য যোগাযোগ—যে দুটি বিষয়ের মুক্তি-কামনায় তিনি সারাজীবনের চিন্তাধারাকে নিয়োজিত করেছিলেন—তা তাঁর সার্থক হয়েছিল। পেয়েছিলেন ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ আর দেখেছিলেন দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্তি। তাই ধন্য জীবন অরবিন্দের!

সার্থক মুক্ত পুরুষ অরবিন্দ।

তাই অরবিন্দের জীবন সম্বন্ধে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের এত কৌতূহল। তাই অগণিত মানুষ প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে এসে ভিড় করতো তাঁকে দর্শন করবার জন্য।

দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত স্বাধীনতালাভ করবার পর শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"যে পথেই হোক, আর যেভাবেই হোক দেশ বিভাগ রহিত হতেই হবে। ঐক্যসাধন করতেই হবে এবং ঐক্যলাভ হবেই, কারণ ভবিষ্যৎ ভারতের অগ্রগতির জন্যই এ প্রয়োজন।"

শ্রীঅরবিন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণীই এখনো সফল হয়নি। দেখা যাক্, কালের বিচারে কি হয়।

ভারতবাসী অনেক কিছু আশা করেছিল অরবিন্দের কাছ থেকে। শুনবে তাঁর মুখ থেকে ভবিষ্যতের আশার বাণী—পাবে কল্যাণের নির্দেশ; সেই প্রতীক্ষায় দিন যাপন করছিল অগণিত নরনারী।

কিন্তু সেই আশা তাদের সফল হল না।

অকস্মাৎ এমন করে মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ ঘটবে তা কেউ ভাবতে পারে নি।

১৯৫০ সালের ৫ই নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করলেন।

এ যেন ঠিক বিনামেঘে বজ্রপাত।

শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল—ভারতবাসী হয়ে পড়ল শোকাভিভূত।

দেশবিদেশ থেকে মানুষ ছুটে আসতে লাগল পণ্ডিচেরীর দিকে। যারা অরবিন্দকে দেখেছে তারা এবং যারা দেখেনি তারাও এসে ভিড় করল পণ্ডিচেরীর আশ্রমে। পণ্ডিচেরী এক

মহাতীর্থে পরিণত হল। শেষবারের জন্য তারা মহাঋষির মরদেহ দর্শন করবে।

শ্রীঅরবিন্দের পার্থিব দেহ তু'তিন দিন অবিকৃত অবস্থায় ছিল। সকলেই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে—সেই দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ।

দেখে দেখে যেন মানুষের সাধ মেটে না।

বার বার দর্শন করে অরবিন্দকে। ভিড় বাড়তেই থাকে। জনতার স্রোত যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে!

শ্রীমা শোকে অভিভূত। কোন কথাই তাঁর মুখ থেকে বেরুচ্ছে না। বিরাট এক ঝড়ের মুখে পড়ে যেন তাঁর জীবনের নীড় গেছে ভেঙে।

অনেক ভক্তের ইচ্ছা ছিল তাদের প্রিয় গুরুর তেজোদীপ্ত শরীর আরও কিছুদিন রেখে দেবে। প্রাণভরে নয়নভরে দেখবে তাদের গুরুদেবকে।

কিন্তু শোক সংবরণ করে স্থির হয়ে বসলেন শ্রীমা। তিনি আদেশ দিলেন শ্রীঅরবিন্দের দেহ সৎকার করবার জন্য। তাঁরই আদেশ রক্ষা করা হল। দেহত্যাগের তুদিন পর শ্রীঅরবিন্দের দেহ সৎকার করা হল।

শেষ হয়ে গেল ভারতের একটি যুগের ইতিহাস। অমর হয়ে রইল ঋষি অরবিন্দের নাম চিরযুগের ইতিহাসে।

সমাপ্ত

দেব সাহিত্য কুটীর